কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

মে ৮৩

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

জুলে ভার্নে-র টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী : লেখা ও ছবি গৌতম কর্মকার

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

3য় বর্ষ 1ম সংখ্যা ॥ মে, 1983

প্রধান সম্পাদক ঃ সমরজিৎ কর

সম্পাদক ঃ রবীন বল

এই বৈশাখ সংখ্যা থেকে 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর তৃতীয় বছরের সূচনা হলো। নতুন বছরে তোমাদের প্রিয় এই পত্রিকাকে আরও শোভনসুন্দর ও আকর্ষণীয় করা হয়েছে।

পত্রিকাকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্যে তোমাদের কাছ থেকে নানা প্রস্তাব আমরা পেয়েছি—সেগুলি বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। 'যা আমি দেখেছি' এই পর্যায়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের প্রতিবেদন ছবি সমেত তোমাদের লিখে পাঠাতে বলছি। এই নতুন বিভাগটি যত শীঘ্র সম্ভব আমরা শুরু করতে চাই।

গত বছর আমরা যে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলুম, তার পুরস্কার ও মানপত্র স্থানাধিকারীদের কাছে ডাকযোগে পাঠানো হয়েছে

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় 1

দপ্তর থেকে

ঘূর্ণিঝড় ॥ সমরজিৎ কর 2

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

মৌকাসাবিস ও ঘনাদা ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র 4

পড়াশোনা

সুপরিচিত খনিজ অ্যাসিড ॥ অমরনাথ রায় 37
জীবন-বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ ॥ তারকমোহন দাস 14
বর্গক্ষেত্রের সাহায্যে গুণ ॥ অসিতকুমার চক্রবর্তী 40

ছবিতে গল্প

জুলভার্নের টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী ॥
গৌতম কর্মকার ঃ প্রচ্ছদ 2, 3
ছবির মজা ॥ প্রণব হোড় ॥ 40
ভানুবাবুর চন্দ্রাভিযান ॥ উজ্জ্বল ধর 38
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ॥ দিলীপ দাস 18
খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 20, 21
হাবুলের বিজ্ঞানভাবনা ॥ ধীরেন বল 24

বিচিত্র প্রাণী

হংসচঞ্চু ॥ অজয় হোম 27
প্রাণীজগতের আত্মরক্ষা ॥ অমিয় পাল 41
বিচিত্র উদ্ভিদ ॥ প্রদীপকুমার ধর 46

উপন্যাস

অল ইণ্ডিয়া কমন পিপ্‌লস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ॥
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 10
সবুজ বনের গান ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 49

জ্ঞানবিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা

সুষম খাদ্য ॥ অনন্ত ঘোষ 26
জানা-অজানা ॥ কল্যাণ সাহা 28
সোনার সন্ধানে ॥ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 29
রাতের আকাশে তারা ॥ বিমান বসু 33
জ্ঞানবিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ ॥ বরুণ মজুমদার 17
সাহারার বুকে নদী ॥ অমিতাভ সেন 19
অটো কাউ ॥ অনিল কর্মকার 23
আগুন নেভাবার যন্ত্র ॥ বিবেক রায় 43
মুক্তা ॥ অলিভকুমার ঘোষ 48
ইংরেজি সাল থেকে বাংলা সালে রূপান্তর ॥
পথিক মণ্ডল 42

নিজে কর

রেন সিগন্যাল ॥ সুদীপ সেন 22

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

কৃতীবিজ্ঞানী বীরেশচন্দ্র গুহ ॥ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 25

আবিষ্কারের গল্প

পেনসিল আবিষ্কারের কাহিনী ॥ বরুণ মণ্ডল 32
অ্যাণ্টি গ্রাভেটি গ্লাস ॥ শঙ্কর দাস 47

ছোটদের দপ্তর

বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তরদাতাদের নাম 53
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তর 5৫, প্রশ্নোত্তর 54
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসা 56
ভেবে ভেবে বল ॥ চন্দন রুদ্র 54
পৃথিবী যদি চুম্বক না হত ॥ অভিজিৎ চন্দ্র 55
সংখ্যাকূট ॥ সুবীরকুমার দাস 56
শব্দকূটের সমাধান 56

সহ-সম্পাদক ঃ জয়ন্ত দত্ত, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

দপ্তর থেকে ঃ সমরজিৎ কর

ঘূর্ণি ঝড়

গত 12 এপ্রিল গাইঘাটায় কি কাণ্ডই না হয়ে গেল। কাউকে এতটুকু বুঝিতে না দিয়ে সেখানে সন্ধ্যের দিকে নামল ঘূর্ণি ঝড়। প্রচণ্ড শব্দ। আর কী বাতাসের বেগ। কয়েকটি গ্রামের ঘর বাড়ি মাত্র এক মিনিটে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। প্রাণ হারাল অনেকে। ঝড় দুমড়ে দিয়ে গেছে লোহার তৈরি বিদ্যুতের তারবাহী থাম।

ঘূর্ণি ঝড় যে কত আকস্মিক এবং ভয়াবহ হতে পারে, বলে শেষ করা যায় না। যেমন ধরো, 22 নভেম্বর 1977-এ অন্ধ্রের উপকূলে যে ঘূর্ণি ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার কথা। ওই ঝড়ের বেগ ছিল ঘণ্টায় 150 কিলোমিটার। তার ঝাপটায় সমুদ্রের জল উত্তাল হয়ে ওঠে। পাহাড়ের মত ঢেউ আছড়ে পড়ে উপকূলবর্তী বসতির উপর। তার দাপটে মুহূর্তে হাজার হাজার ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শুধু অন্ধ্রেই মারা যায় দশ হাজারের মতো মানুষ।

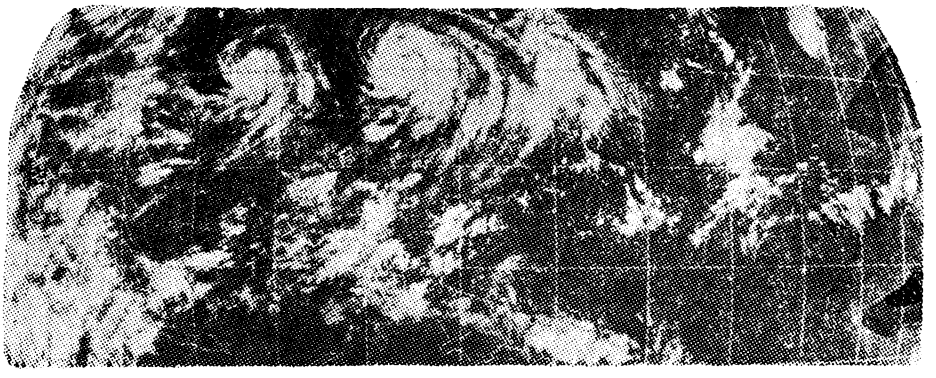

পুরনো একটি খবর বলি, শোন। খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল 'দ্য নিউইয়র্কার' পত্রিকায়, 12 নভেম্বর 1938 সালে। খবরটি ছিল এই রকম ঃ লং আইল্যাণ্ডের এক ভদ্রলোক। সাধ করে আবারক্রমবাইস অ্যাণ্ড ফিচ নামে এক কোম্পানিকে একটি দামী ব্যারোমিটার অর্ডার দিলেন তিনি। যথাসময়ে ব্যারোমিটারটি এল। কিন্তু কি কাণ্ড! তার চাপ নির্দেশক কাঁটাটি এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে, যা দেখলে মনে হয় এখুনি ঝড় উঠবে। অথচ বাইরে ঝড়ের কোন লক্ষণই নেই। ভদ্রলোক তো চটে আগুণ। ভাবলেন কোম্পানি তাঁকে ঠকিয়েছে। অমনি কোম্পানির নামে কড়া চিঠি লিখে ফেললেন তিনি। তার পর চিঠিটি ডাকে দেবার জন্যে ছুটলেন দূরের একটি পোস্ট অফিসে।

কপাল কাকে বলে। পোস্ট অফিস থেকে ফিরে তিনি তো অবাক! বাড়ি গেল কোথায়? তাঁর বাড়ি খায় সেই ব্যারোমিটারটি হঠাৎ এক ঘূর্ণি ঝড়ের কবলে পড়ে একেবারে লোপাট! আশপাশেও একই অবস্থা। মারা গেল প্রায় ছ'শ জন। আহত দু'হাজার। সম্পত্তির ক্ষতি পাঁচ কোটি টাকা। পোস্ট অফিসে না গেলে ব্যাচারা ভদ্রলোকও হয়ত নিঃশেষ হয়ে যেতেন।

বলতে কি, দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব এবং পশ্চিম উপকূলে প্রতি বছর গড়ে ঘূর্ণি ঝড়ের আবির্ভাব ঘটে দুই থেকে চার বার। মার্কিন দেশে তিনবার। জাপান এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পাঁচ। বাংলা দেশে তিন।

ঘূর্ণি ঝড় মানেই যেন এক বিভীষিকা। এই সময় ধাবমান বাতাসের আঘাত করার ক্ষমতা দাঁড়ায় অপরিসীম। এই ঝড়ে সমুদ্র উপকূলে দেখা দেয় প্রবল জলোচ্ছাস। আর সেই সঙ্গে ঝড়ের দোসর হিসেবে নামে প্রবল বর্ষণ। দেখা দেয় প্লাবন।

ইংরেজিতে ঘূর্ণিঝড়কে বলা হয় 'সাইক্লোন'। উষ্ণমণ্ডলীয় সামুদ্রিক অঞ্চলের কোথাও কোথাও একে বলা হয় টরনেডো, হ্যারিকেন বা টাইফুন। অবশ্য ঘূর্ণি ঝড়ের সম্মুখ গতি যদি ঘণ্টায় 130 কিলোমিটার বা তার বেশি হয় তবেই তাকে টরনেডো, টাইফুন বা হ্যারিকেন নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই বেগ কখনো কখনো ঘণ্টায় 240 থেকে 350 কিলোমিটার হতেও দেখা গেছে।

মুশকিল কি, জানো? ঘূর্ণি ঝড় কোথায় এবং কি ভাবে সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা আজও পর্যন্ত করা সম্ভব হয় নি। আবহাওয়াবিজ্ঞানীরা শুধু এটুকু জানেন, প্রধানত এই ঝড়ের জন্ম উষ্ণমণ্ডলীয় সামুদ্রিক অঞ্চলে। জন্মের পর ছড়িয়ে পড়ে চার'শ থেকে ছ'শ কিলোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট এলাকায়। আর এই ঝড়ের

স্থিতিকাল এক থেকে তিরিশ দিন।

ঘূর্ণি ঝড়ের কেন্দ্রস্থলকে বলা হয় 'চোখ'। ইংরেজিতে বলা হয় eye। কেন্দ্র স্থলে বাতাসের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে কম থাকে। বাতাস অপেক্ষাকৃত শান্ত। এই বাতাসের তাপমাত্রা দাঁড়ায় আশপাশের তাপমাত্রা থেকে প্রায় ৬ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। জলের তল থেকে প্রায় 150 মিটার উপরে তৈরি হয় ঘূর্ণি ঘরের চোখ। সেই 'চোখ'-কে কেন্দ্র করে জমতে থাকে জলীয় বাষ্প। সেই বাষ্প সোজা আকাশের দিকে উঠতে থাকে। তখন তার চেহারাটা দাঁড়ায় স্তম্ভের মত। এই স্তম্ভের উচ্চতা পনের থেকে কুড়ি হাজার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। দূর থেকে মনে হয় যেন মেঘের স্তম্ভ।

চরিত্রে ঘূর্ণিঝড় যেন অতিকায় একটি বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মত। যে অঞ্চলে তার 'চোখ'টি তৈরি হয়, সেখানে বাতাসের চাপ থাকে কম। তাই সমুদ্রের জল দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে সেখানে ছুটে আসতে থাকে। এসে উষ্ণতর হয়। কারণ এই মাত্র বললাম যেখানে চোখ সেখানকার তাপমাত্রা আশপাশের চেয়ে বেশি। জলীয় বাষ্প এবং বাতাস চোখে এসে উষ্ণ হলে আয়তনে বাড়ে। হাল্কা হয়। তখন তা সেই মেঘের স্তম্ভ বেয়ে ঊর্ধাকাশে উঠতে থাকে।

ঊর্ধাকাশে বাতাসের চাপ কম, সে তো তোমরা জানোই। তাই সেখানে যাওয়ার পর বাতাস এবং জলীয় বাষ্প সম্প্রসারিত হয়। তখন জলীয় বাষ্প তার কিছুটা তাপ আশপাশে ছেড়ে দিয়ে শীতল জলবিন্দুতে রূপান্তরিত হয়। আর তখনই ঘটে সাংঘাতিক একটি কাণ্ড। সমুদ্র-তল থেকে উঠে আসা বাষ্প ঊর্ধাকাশে যে তাপ ছেড়ে দেয় সেই তাপে সেখানকার বাতাস গরম হয়ে ওঠে। গরমের ফলে হয় সম্প্রসারিত। সম্প্রসারিত এই বাতাস তখন প্রবল বেগে ছুটতে থাকে। শুরু হয় ঝড়।

শুনলে অবাক হবে, সমুদ্রের বুকে সৃষ্ট প্রমাণ আয়তনের এক একটি ঘূর্ণি ঝড় প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় জলীয় বাষ্প শোষণ করে প্রায় কয়েক হাজার টন। যার শতকরা আশিভাগ পরে ঘনীভূত হয়ে সৃষ্টি করে প্রবল বর্ষণ। এর জন্যেই ঘূর্ণিঝড়ের সময় প্রবল বর্ষণ হতে দেখা যায়।

শুনলে অবাক হবে, জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে যখন বৃষ্টিবিন্দু তৈরি করে তখন ওই বাষ্প থেকে বেরিয়ে আসে বিপুল পরিমাণ তাপশক্তি। যাকে বলা হয় 'লীন' তাপ (ধরো এক গ্লাস জল। তার তাপমাত্রা 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওই জলে যদি আরো তাপ দেওয়া যায়, দেখবে, জলের তাপমাত্রা বাড়ছে না, জল রূপান্তরিত হচ্ছে বাষ্পে। অর্থাৎ তরল জলের অবস্থা পালটে হচ্ছে বাষ্প। যতক্ষণ পর্যন্ত ওই জল না বাষ্পে রূপান্তরিত হচ্ছে, দেখবে

ঘূর্ণি ঝড়ের 'চোখ'

জলের তাপমাত্রা বাড়ল না। জলের তাপমাত্রা না বাড়িয়ে যে পরিমাণ তাপ জলের শুধু অবস্থার রূপান্তর ঘটালো সেই পরিমাণ তাপকে বলা হয় জলের বাষ্পীভবনের লীন তাপ। বাষ্প জলে রূপান্তরিত হওয়ার সময় বাষ্প এই তাপ ছেড়ে দেয়)। দেখা গেছে, একটি প্রমাণ আকারের ঘূর্ণিঝড়ের সময় জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে যে পরিমাণ তাপশক্তি ছেড়ে দেয় তার পরিমাণ চারশ'টি কুড়ি মেগাটনের পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের সময় যতটা উত্তাপ সৃষ্ট হয়, তার সমান। এই উত্তাপের মাত্র ২ থেকে ৪ শতাংশ গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই গতিশক্তিই ঘূর্ণি ঝড়কে প্রবল বেগে ঠেলে দেয় সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের দিকে। কখনো বা উপকূল ছাড়িয়ে স্থলভাগের অভ্যন্তরে।

সমুদ্রের উপর ঘূর্ণিঝড় যাতে তৈরি হতে না পারে তার জন্যে নানা রকম পরিকল্পনার কথা ভেবেছেন বিজ্ঞানীরা। এখন কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সমুদ্রের কোথায় ঘূর্ণিঝড় দানা বাঁধছে আগে থেকে জানা যায়। একদল বলছেন, সমুদ্রের যেখানে চোখ সৃষ্টি হয়, সেখানে সমুদ্রের উপর ছড়িয়ে দিল বিশেষ ধরনের রাসায়নিক যৌগ। এই যৌগ ওই জায়গায় সমুদ্রের উপর পাতলা আস্তরণের মত ছড়িয়ে পড়বে। এতেকরে জলের বাষ্পী ভবন হবে কম। পাতলা আস্তরণ জলের তল ঢেকে রাখবে বলে। আবার কেউ কেউ বলছেন ঘূর্ণিঝড়ের চোখের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হোক 'ড্রাই আইস' (কার্বন ডাই-অকসাইডের বরফ)। তা হলে চোখের অঞ্চলটি ঠাণ্ডা থাকবে। বাষ্পীভবন হবে কম। তা হলে ঘূর্ণিঝড় আর শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে না। আরো অনেক কথাই ভাবছেন অনেকে।

তবু ঘূর্ণিঝড় এখনও রহস্য। মানুষের কাছে এখনও বিভীষিকা।

মৌকাসাবিস ও ঘনাদা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

না, অনুমানে আমাদের ভুল হয়নি।

একটু ধৈর্য ধরে ক'দিন অপেক্ষা করার পরই আমাদের আশা পূর্ণ হল। চিঠির বাক্সটা আমিই খুলতে গিয়েছিলাম। বাক্স খুলে চিঠি একটাই পেলাম। কিন্তু সেই একটা চিঠির জন্যেই আমাদের এ কয়দিনের এমন হা পিত্যেশ করে বসে থাকা —

চিঠিটা হাতে পেয়ে খুলে পড়বার আর দরকার হয়নি। ওপরে নামটা যা লেখা আছে সেইটুকুই তখন যথেষ্ট।

সেই নামটুকু দেখে নিয়েই সোজা ওপরে ছুটে গেছি। না, আমাদের আড্ডা ঘরে নয়। এই ভরদুপুর বেলা সে জায়গাটা একরকম নিরাপদ হলেও, সাবধানের মার নেই বলে সটান গৌর আর শিবুর কামরাতেই বেশ একটু হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে ঢুকেছি। হাঁফানোটা অবশ্য সবটাই সিঁড়ি দিয়ে এক এক লাফে দুটো করে ধাপ পেরিয়ে আসার জন্য নয়। ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ওটা একটু বাড়তি অভিনয়।

সে অভিনয়টুকুর অবশ্য দরকার ছিল না।

শিবু বাদে গৌর আর শিশির দুজনেই তখন সে ঘরে গৌরের খাটের ওপর বসে দেখা-বিন্তি খেলছে।

আমায় ঢুকতে দেখেই তারা বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—এসেছে! এসেছে তাহলে?

আমার চোখমুখের উত্তেজনা আর বাড়তি হাঁফানিটুকুর জন্য নয়, আমার হাতের লেফাকাটিই তাদের লাফ দিয়ে ওঠানোর পক্ষে যথেষ্ট।

—আরে চুপ! চুপ! টঙের ঘর পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলবে যে!—বলে ওদের থামিয়ে লেফাফাটা এবার সামনের টেবিলে রাখলাম। হ্যাঁ, এ যে আমাদেরই বড় আশার ধন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ব্রাউন রংয়ের লম্বাটে অফিসের কাজে যেমন ব্যবহার হয় সেই জাতের খাম। খামটার ওপরে নামঠিকানা টাইপ করার বদলে হাতেই লেখা।

যাঁর উদ্দেশে চিঠিটা পাঠানো হাতে লেখা তাঁর নামটাই অবশ্য আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। নামটা যে শ্রীঘনশ্যাম দাস তা বোধহয় কারুর বুঝতে এতক্ষণে বাকি নেই।

নামের পরে ঠিকানাটা ছিল এক নামকরা বইয়ের প্রকাশকের দোকানের। ঘনশ্যাম দাস নামটা দেখে সেই দোকান থেকেই সে ঠিকানাটা কেটে এই বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনে চিঠিটা রি-ডাইরেক্ট করে দেওয়া হয়েছে।

চিঠিটা কোথা থেকে আসছে তাও বুঝতে অসুবিধা হয়নি, খামের ওপর লেখা 'প্রেরক—মৌ-কা-সা-বি-স' দেখে।

মৌ-কা-সা-বি-স এর আগের চিঠিটি ঠিক এইভাবেই এক প্রকাশকের ঠিকানায় এসেছিল। সে প্রকাশক অবশ্য আলাদা। মৌ-কা-সা-বি-স এর সেই একটি চিঠিই এর আগে আমরা পেয়েছি। কিন্তু সে চিঠি এমন যে, প্রথম আমাদের হাতে পড়বার পর থেকেই এই ক' হপ্তা ধরে আমাদের আর সব চিন্তা-ভাবনা একরকম ভুলিয়ে দিয়েছে।

মৌ-কা-সা-বি-স এর প্রথম চিঠিটার সামান্য বিবরণ যা বেরিয়েছিল যাদের চোখে পড়েনি তাদের জন্যে সংক্ষেপে ব্যাপারটা একটু বলে নেওয়া উচিৎ মনে হচ্ছে।

মৌ-কা-সা-বি-স যে শব্দগুলির আদ্যক্ষর দিয়ে গাঁথা তা হল 'মৌলিক কাহিনী সার বিপণন সংস্থা'। প্রায় মাসখানেক আগে এই সংস্থার যে চিঠিটি এক প্রকাশকের ঠিকানা থেকে আমাদের বাহাত্তর নম্বরের পোস্ট বাক্সে এসে পৌঁছয় সেটি ঘনশ্যাম দাসের নামেই পাঠানো হয়েছিল।

ঘনশ্যাম দাসের নাম থাকা সত্ত্বেও সে চিঠি যে আমরা খুলে পড়েছিলাম তার সোজা কারণটা এই বলা যেতে পারে যে চিঠিটায় ঘনশ্যাম দাসের নাম থাকলেও সেটা সোজাসুজি তাঁর বাহাত্তর নম্বরের ঠিকানায় না পাঠিয়ে কোন এক প্রকাশকের মারফৎ পাঠানো।

এরকমভাবে যে বা যারা চিঠি পাঠিয়েছে তারা ঘনাদার জানাশোনা কেউ যে নয় তা অনায়াসেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

ঘনাদার চিঠির অমন বেপরোয়া খোলার সাহস করার আসল কারণ কিন্তু আলাদা। সে কারণ হল এই যে, ঘনাদার ভাবগতিক যা দেখেছি তাতে তিনি তাঁর নামের চিঠি আসাটা যেন পছন্দ করেন না মনে হয়। অপছন্দ করার চেয়ে ভয় করেন বললে যেন তাঁর ধরণ ধারণটা ভালো করে বোঝানো যায়।

শিবুর একটা চিঠির ব্যাপার থেকেই কথাটা আমাদের প্রথম মনে হয়। শিবু সেবার কিছুদিনের জন্য তার এক মামার সঙ্গে পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিল। চিঠিপত্তর লেখা শিবুর বড় একটা ধাতে আসে না। কিন্তু সেবার ঘনাদাকে একটু উপরি খাতির দেখাবার জন্য সে তাঁর নামেই একটা চিঠি পাঠিয়েছিল আমাদের এই বাহাত্তর নম্বরে। ঠিকানায় হাতের লেখাটা শিবুর বলে বুঝে আগ্রার পোস্ট অফিসের ছাপ দেখে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেও চিঠিটা আমরা খুলিনি। উৎসাহ ভরে সেটা ঘনাদার কাছেই পৌঁছে দিতে তাঁর টঙের ঘরে হাজির হয়েছি।

কিন্তু তার নামে চিঠি আছে শুনে খুশি হবার বদলে তিনি কেমন অস্থির। সে অস্থিরতাটা বিরক্তির মেজাজ দেখিয়েই ঢাকা দেবার চেষ্টায় তিনি রুক্ষ গলায় বলেছিলেন, —চিঠি! আমার নামে চিঠি কোথা থেকে আসবে? কথাগুলো এমনভাবে তিনি বলেছিলেন যেন তার নামে চিঠি আসাটা সরকারী গোয়েন্দা দপ্তরের হুঁশিয়ারির গাফিলতি। চিঠিটা তারপর তিনি আর নিতেই চান নি। চিঠিটা ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আমরাও বুঝেছি যে ক্বচিৎ কদাচিৎ নেহাৎ নিজের বিশেষ দরকারে নিজে থেকে দুনিয়ার দু একজন হেন-তেন-র ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আসা স্বীকার করলেও তিনি তার ছদ্মনামের অজ্ঞাতবাসে সাধারণ চিঠিপত্রে যোগাযোগের মানুষ নন।

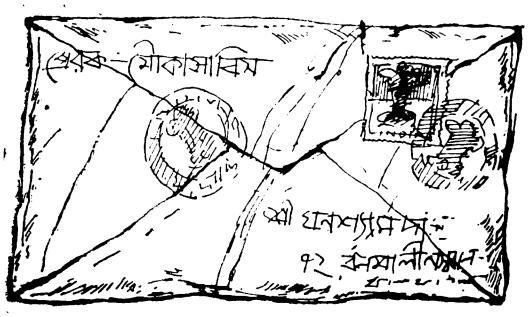

তাঁর নামের চিঠি এলে বিনা দ্বিধাতেই তাই আমরা খুলি। মৌ-কা-সা-বি-স এর প্রথম চিঠি সেইভাবেই খুলে কিন্তু বেশ একটু মজা পেয়েছিলাম। সে প্রথম চিঠিতে লেখকদের নতুন গল্পের খেই যোগানোই যে মৌ-কা-সা-বি-স এর ব্যবসা তা জানিয়ে ঘনাদাকে তাঁর গল্পের পুঁজি বাড়িয়ে সাহায্য করবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যোগাযোগ করবার একটা উপায় সে চিঠিতে দেওয়া থাকলেও আমরা মজার ব্যাপারটা আরো গড়াতে দেবার জন্য সে চিঠির উত্তর কিছুদিন দিই নি। এরপরে আবার মৌ কা-সা-বি-স এর চিঠি পাবই ভেবে নিয়ে অপেক্ষা করেছিলাম ধৈর্য ধরে।

আমাদের অপেক্ষা করা বিফল হয়নি।

মৌ কা-সা-বি-স এর দ্বিতীয় চিঠিটা খুলে নতুন করে উৎসাহিত হবার খোরাকও পেলাম।

প্রথম চিঠিতে কি রকম গল্পের তারা যোগান দিতে পারে তার একটু নমুনা দেওয়া ছিল। এবারের চিঠিতে নমুনা-টমুনা দেওয়ার বদলে প্রথম থেকেই যেন আক্রমণ শুরু।

ঘনশ্যাম দাস আর নয়, সোজাসুজি ঘনাদা বলে সম্বোধন করে লেখা—

'কি ঘনাদা, আমাদের চিঠি পেয়ে ভড়কে গেলেন নাকি! একবার একটা চিঠি দিয়ে একটু পরখ করে দেখবারও সাহস হল না? শুনুন, শুনুন, আগে থেকেই ভরসা দিয়ে রাখছি, আমাদের আগে থাকতে কিছু দিতে হবে না। আগে দুচারবার কারবার করে দেখুন তাতে সন্তুষ্ট হলে তখন যা মর্জি হয় দেবেন। আমাদেরও অবশ্য একটা শর্ত আছে।

কাউকে খদ্দের করবার আগে আমরা তাঁকে একটু যাচাই করে নিই। অনেককাল ধরে অনেক সরেস নিরেস গল্পের ছক প্যাঁচালেন। ঘিলুটা তাতে ঘোলাটে হয়ে গেছে কি না তাই একটু পরখ করে নিতে চাই। বেশী কিছু নয়, সামান্য দুচারটে প্রশ্ন। জবাবগুলো চটপট দিতে পারেন কিনা দেখুন। না পারলে জবাবগুলো অবশ্য চিঠিটার ভেতরের পাতাতেই উল্টো করে লেখা পাবেন। এমনিতে কথাগুলো যেন আবোল তাবোল, কিন্তু আয়নার সামনে ধরলেই সেখানে সোজা অক্ষরগুলোর সঠিক কথাটা পেয়ে যাবেন। এই যেমন আপনি লেখায় পেলেন,

'ইনে নেখাসে উকে'

কিছু মাথামুণ্ডু নেই মনে হচ্ছে ত? এখন আয়নার সামনে ধরলেই কথাগুলো আর আবোল তাবোল থাকবে না। উত্তরটা অমন করে দেখবার আপনার দরকার হবে না বলেই আশা করছি। এখন ভাবুন:

১। খাঁ খাঁ রোদের রাজ্যে যে পাহাড়ের চূড়ার তুষার গলে না।

২। একশো বছরেরও আগে মিশরের কায়রো শহরে, নানা গরিবানী কাফিখানায় ঘুরে ঘুরে হাজার এক আরব্য রজনীর অপরূপ সব কিস্‌সা তিনি নতুন করে উদ্ধার করেছিলেন। আর সে কীর্তির আগে ভারতের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে তিনি ছিলেন এক সেনাপতি। সিপাহী বিদ্রোহের বছর ১৮৫৭তে তিনি ছিলেন কোথায়? আর তার পরের বছর কোথায় কি এমন আবিষ্কার করেছিলেন, যা তুলনাহীন। তার আবিষ্কারের সংগে 'উজিজি' শব্দটা উচ্চারণ করলে পুরোনো কোন ইতিহাসের স্মৃতি ঝলকে ওঠে কি?

৩। উনিশ শ চোদ্দ ছাড়িয়ে প্রায় আঠারো পর্যন্ত জার্মান রপ্ত করে আবার তা ভুলে ইংরেজি শিখতে হয়েছিল কোথায়, কাদের?

৪। একসঙ্গে জিরাফ, উটপাখি আর শিম্পাঞ্জি খুঁজতে যাব কোথায়?

এ সব প্রশ্নের জবাব মনে মনে দিয়ে ঠিক হয়েছে না বেঠিক পেছনের পাতা উল্টে দেখে নিন। চারটের মধ্যে তিনটেও যদি ঠিক হয়ে থাকে যে কোন বড় কাগজের ব্যক্তিগত কলমে এক লাইনে 'প্রস্তুত' বলে একটা বিজ্ঞাপন দিন। তাহলেই আপনার যা এরপর করবার মৌ-কা-সা-বি-স এর নির্দেশের সেই পরের কিস্তি পেয়ে যাবেন। জিরাফ আর উটপাখি ছোটা তেপান্তরে সোনালী সমুদ্দুরের মতো বোথা আর স্মাটদের সোনালী গমের খামার কিভাবে ছড়াচ্ছে তার রহস্য জানাবো।'

এ চিঠি আদ্যোপান্ত বার কয়েক পড়বার পর রীতি-মতো ভাবনাতেই পড়লাম আমরা তিনজন। শিবু তখনও আসেনি। কিন্তু সে এলেও বিশেষ কিছু বুদ্ধি বাৎলাতে পারত বলে মনে হয় না।

এ চিঠি নিয়ে এখন কি করা যাবে সেইটাই হল সমস্যা। ঘনাদাকে এ চিঠি এখন দিতে যাওয়া যায় না!

যে কোন চিঠি সম্বন্ধে তার পাকা 'এলার্জি' ত আছেই, তার ওপর প্রথম চিঠিটা বেমালুম চেপে গিয়ে দ্বিতীয় চিঠিটা দিতে যাওয়ার কৈফিয়ৎটা হবে কি?

তা হলে এ চিঠিটাও কি বেমালুম হজম করে ফেলব? —কিছুতেই না।

জোরালো প্রতিবাদটা কিছুক্ষণ আগে ঢোকা শিবুর। নিজের মতটাকে জোরালো যুক্তির গাঁথুনি দিয়ে সে বললে। ঘনাদাকে মাপবার এমন একটা মৌকা হেলায় হারালে আফ্‌শোষের সীমা থাকবে না যে!

কিন্তু ঘনাদার হাতে এ চিঠি তুলে দেব কি বলে? —আমাদের ভাবনা।

তাঁর হাতে তুলে দেব কেন?—শিবুর ব্যথা - ও চিঠি নিজেদের কাছেই রেখে এসব প্রশ্নের ধাঁধা তার নাকের সামনে যেন অজান্তে ঘোরাবো।

কি ভাবে!— আমাদের বিমূঢ় জিজ্ঞাসা

কি ভাবে তা আমিই কি জানি!—শিবু অকপটে স্বীকার করে জানালে। কিন্তু সময় মতো কি ঠিকঠাক বুদ্ধিগুলো যোগাবে না! দেখাই যাক না।

তা মোটমাট আমরা খেলাটা খুব মন্দ খেলিনি। কাচা চাল দু একটা দিয়ে ফেলিনি এমন নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি বানচাল হওয়া থেকে নৌকোটা বাঁচিয়েছি।

টঙের ঘরে অভিযানে যাবার আগে অবশ্য রসদের কথা ভুলিনি। আমরা প্রথম তিনজন একটু আগে পরে করে যেন নেহাৎ আড্ডা দেবার জন্যই উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘরে এসে বসবার পর শিবু একটু ব্যস্তভাবেই ঘরে ঢুকেছে। ঢুকেছে সে একলা নয়, সঙ্গে তার বনমালী আর বনমালীর এক হাতে ঢাউস টিফিন কেরিয়ার আর অন্য হাতে বড় ঝোলার মধ্যে ডিশ, প্লেট, বাটি ইত্যাদি তৈজসপত্র।

দিগ্বিজয়ীর হাসি হেসে ঘনাদার দিকে চেয়ে বলেছে— না, লোভ সামলাতে আর পারলাম না ঘনাদা। নিয়েই এলাম এই নতুন অপূর্ব জিনিষ।

নতুন অপূর্ব জিনিষ! আমরা সন্দিগ্ধভাবে শিবুর দিকে তাকিয়ে বলেছি – নতুন জিনিষ মানে খাবার! এই শহরে পাওয়া যায় অথচ বাহাত্তর নম্বরের অজানা এমন কোন নতুন খাবার আছে নাকি? শিশির থামতেই গৌর খেই ধরে বলেছে—দেশী বিদেশী চীনে জাপানী ইরানী তুরানী কাশ্মিরী না তামিল···

থাম থাম! কথার মাঝখানে গৌরকে থামিয়ে দিয়ে শিবু বলেছে,—আজগুবী বিদেশ বিভুঁইয়ের নয়, এই আমাদের দেশেরই জিনিষ, কিন্তু খাসনি কখনো, নামও শুনেছিস কিনা সন্দেহ। শুনেছিস কখনো 'উত্তাপাম্' নামটা।

শিবু যতক্ষণ বক্তৃতা দিচ্ছে, তার মধ্যেই টিফিন ক্যারিয়ার খুলে সর্বপ্রথম ঘনাদার সামনে বনমালী প্লেট, ডিশ সাজিয়ে তার মধ্যে একটা গোলাকার মোটা পরোটার মতো খাদ্য বার করে দিয়ে সঙ্গের ছোট বড় পাত্রগুলোও নাতি-তরল বস্তুতে পূর্ণ করে দিয়েছে।

সেইদিকে তাকিয়ে আমাদের দৃষ্টি পরিচালিত করে শিবু এবার বলেছে, এ আহার্য দেখবার ও চাখবার সৌভাগ্য কি কখনো হয়েছে? অথচ এ আমাদের দক্ষিণ ভারতের জিনিষ নাম উত্তাপাম্। সঙ্গে ছোট ছোট পাত্রে যা পরিবেশিত হয়েছে সেই নারিকেল মণ্ড চাটনি আর অন্য পাত্রের সম্বর ডালের সঙ্গে সেব্য।

শিবুর বক্তৃতা শেষ হবার আগেই বনোয়ারী সুনিপুণ হাতে আমাদের সকলের সামনেই প্লেটে বাটি বসিয়ে তাতে অভিনব 'উত্তাপাম্' সাজিয়ে দিয়েছে।

ঘনাদার মুখে কোন মন্তব্য এখনো না শোনা গেলেও শিবুর অভিনব আমদানির দু চার টুকরো যথাযোগ্য অনুপান সহকারে মুখে তুলতে তিনি ত্রুটি করেন নি। তাঁর মুখে অতিরিক্ত আহ্লাদ কিছু ফুটে না উঠলেও বিকৃতিও দেখা যায়নি কিছু।

এর মধ্যে শিশির খেলায় প্রথম চাল চেলে বলেছে তা নেহাৎ অখাদ্য কিছু অবশ্যই নয়, কিন্তু···

কিন্তুটা কি?—শিবু গরম হয়ে উঠেছে। এই উত্তাপাম্ এর মধ্যে কিন্তুটা কোথায় পাচ্ছ শুনি।

খেই পেয়ে গিয়ে আমি এবার একটু মেজাজী গলায়

বলেছি,—কিন্তু একটু আছে বৈকি! নামটা যেমনই হোক জিনিষটি ওই দোসার রকমফের নয় কি!

দোসার রকমফের এই উত্তাপাম্?—শিবু যেন চরম অপমানে তোৎলা হয়ে গিয়ে বলেছে,—তো-তোমাদের কি করতে হয় জানো? 'ইকোয়েটর'-এর লাগাও খাঁ খাঁ রোদের রাজ্যে ভিসুভিয়াসের মরা জাতভাই এর মাথায় বরফের চূড়ায় তুলে দিতে হয়। তখনো হয়তো তোমরা বলবে, এর আর নতুন কি?

—দাঁড়াও! দাঁড়াও!—আমরা যেন দিশাহারা হয়ে বললাম, আমাদের না তোমার কার মাথার ঘিলুটা নড়ে গেছে আগে বুঝি! কি বললে তুমি? 'ইকোয়েটর' এর লাগাও মানে বিষুবরেখার কাছাকাছি খাঁ খাঁ রোদের রাজ্যে ভিসুভিয়াসের মানে সেই বিখ্যাত 'ভলক্যানো'র মরা ভাইয়ের বরফ ঢাকা চূড়ায়···

এই পর্যন্ত বলেই আমরা হাসতে শুরু করলাম, শিবুকে যেন তেলে-বেগুনে জ্বালিয়ে।

হাসছ! তোমরা হাসছ!—শিবু আমাদের দিকে তখন এমন হিংস্রভাবে চাইলে যেন আমাদের বিকশিত দন্তপাঁতিগুলো গুঁড়ো না করে তার তৃপ্তি নেই।

হ্যাঁ, হাসছি! আমরা নির্বিকারভাবে ঘনাদাকেই সালিশী মেনে বললাম,—ঘনাদাই বলুন না, এরকম প্রলাপ শুনে না হেসে পারা যায়।

ঘনাদা তখন তার তৃতীয় উত্তাপাম্‌টি শেষ করার পর বনোয়ারীর টিফিন ক্যারিয়ারের অন্য একটি পাত্র থেকে বড় চামচে বার করে দেওয়া সুগন্ধে ভুরভুর ছানার পোলাও সবে একটু চাখতে শুরু করেছেন।

আমাদের জিজ্ঞাসায় তাঁর মুখে সামান্য যে একটু হাসির আভাস দেখা গেল, সেটা করুনার না 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি, গোছের দায় এড়ানো চতুরতার, তা বোঝা শক্ত বলে তাঁকে আবার একটু উস্কে দেবার চেষ্টায় বলতে হল—

—কি বললে শুনলেন ত। বিষুবরেখার কোথাও খাঁ খাঁ রোদের রাজ্যে ভিসুভিয়াসের মরা ভাইয়ের···

—হ্যাঁ হ্যাঁ আমিই বলছি—শিবুই কথাটা যেন আমাদের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে গড়গড় করে বলে গেল,

—তুষার ঢাকা চূড়োয়···এই তোমাদের আজগুবী মনে হচ্ছে? তা হলে যদি জিজ্ঞাসা করি সিপাইযুদ্ধের পরের বছরে যিনি আর কি আশ্চর্য অজানা কিছু আবিষ্কার করেছিলেন, তার আগের বছরে তিনি কোথায় ছিলেন? এর পর সেই আশ্চর্য মানুষটি মিশরের কায়রো শহরের কাফিখানায় ঘুরে ঘুরে আরব্য উপন্যাসের হাজার এক রজনীর উপাখ্যান নতুন করে উদ্ধার করেন।

—থামো থামো! আমরা নিজেদের মাথাগুলো দুধারে চেপে ধরে বললাম মাথায় একেবারে চরকিপাক লেগে গেছে।

—তাহলে আরো একটু লাগাই!—বলে শিবু যেন মজা পেয়ে বলে গেল—এই সঙ্গে যদি 'উজিজি' শব্দটা যদি উচ্চারণ করি তাতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় কি? আমি যেন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠার ভান করে রীতিমতো বিরক্তির সঙ্গে বললাম্—শোন শোন, অত যদি আবোলতাবোল বকবার শখ থাকে ত নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে দরজা বন্ধ করে মনের সুখে যা খুশি বলগে যাও। আমাদের এমন জ্বালাতন করবার অধিকার···'

—অধিকার আমার নেই বলছ? কিন্তু এত জ্বালাতন না হয়ে তোমাদের নিরেট মাথাগুলো একটু নাড়া দিয়ে সচল করার চেষ্টাও ত হতে পারে। তাই বলছি ঊনিশশ চোদ্দ থেকে প্রায় আঠারো পর্যন্ত জার্মান শিখতে শিখতে কাদের আবার ইংরেজি শিখতে হয়েছিল। আর জিরাফ উটপাখি আর শিম্পাঞ্জী যেখানে পাওয়া যায় সেখানে উটপাখি ছোটা তেপান্তরে অঢেল মিঠে জলের মদৎ পেয়ে বোথা আর স্মাটস্‌দের সোনালী পাকা গমের সব খামার ছড়াতে ছড়াতে কালামাটি ধলা করবে আর কতদূর?

ভুল! ভুল!!

সত্যিই আমরা চমকে উঠেছি সবাই। মায় শিবু পর্যন্ত। কথাগুলো জোরালো গলায় প্রতিবাদ নয়। একটু কৌতুক মেশানো টিপ্পনীর মতো। কিন্তু গলাটা স্বয়ং ঘনাদার।

তার দিকে ফিরে দেখি প্লেট সাফ করে বনোয়ারীর পরিবেশনের মর্যাদা রেখে তিনি রামভুজের আনা স্পেশ্যাল চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে একটু হাসছেন।

প্রথমটা একটু ধাঁধার মধ্যে পড়লেও গৌরই প্রথম গলায় উপরি উৎসাহ ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ভুল ত? শিবু যা বলেছে সবই গুল মানে ভুল···

—না সব নয়। ওই ঘনাদা তাঁর বাড়িয়ে ধরা ডান তর্জনী আর মধ্যমার মধ্যে গুঁজে দেওয়া শিশিরের সিগারেটটা মুখের কাছে এনে শিশিরের লাইটারের অপেক্ষাতে কথাটা অসমাপ্ত রাখলেন। তারপর শিশির সিগারেটটা ধরিয়ে দেবার পর দুটি সুখটান দিয়ে ধীরে ধীরে বললেন—প্রথম যা সব বলেছে তার কোনটাই ফালতু বুকনি নয়।

ফালতু বুকনি নয়! আমাদের এবার আর অবাক হবার ভান করতে হল না।—ওই যে কি বলছিল ভিসুভিয়াসের মরা খাঁ খাঁ রোদের রাজ্যে তুষার চূড়ায় পাহাড়···

হ্যাঁ, ও সবই সঠিক বর্ণনা – ঘনাদা সস্নেহে আমাদের অজ্ঞতা যেন ক্ষমা করে বললেন –শিবু যা যা বললে, সবই পৃথিবীর একটি বিশেষ জায়গার নানা রকমারি বিবরণ। বিষুবরেখার লাগাও খাঁ খাঁ রোদের রাজ্যে ভিসুভিয়াসের মরা ভাই এক তুষার চূড়ার পাহাড় সত্যিই আছে। আফ্রিকার সবচেয়ে উঁচু সে পাহাড়ের নাম কিলমানজারো। বহু বহর কাল আগে ও পাহাড়টা সত্যিই ছিল এক আগ্নেয়গিরি। তারপর সে আগ্নেয়গিরি কবে থেকে ঠাণ্ডা হয়ে আছে। ও কিলমানজারোর কাছেই আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিষ্টি জলের হ্রদ। সাইবিরিয়ার এক বৈকাল হ্রদ ছাড়া যার চেয়ে গভীর হ্রদও দুনিয়ায় নেই।

ভারতবর্ষের সিপাই বিদ্রোহ হয় ১৮৫৭তে। ঠিক তার কিছু আগে ঐ ভারতের বৃটিশ সেনাবাহিনীর একজন সেনাপতি এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে নীল নদের উৎস আবিষ্কারের আশায় দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। নীল নদ তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি। কিন্তু সিপাই বিদ্রোহের পরের বছর ১৮৫৮ সালে সে আবিষ্কারের পথে নীল নদের উৎস রহস্যের কয়েকটি অমূল্য সমাধান সূত্রের সন্ধান পান। এ গুলির প্রধান হল ওই কিলমানজারো পাহাড়ের রাজ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিষ্টি জলের হ্রদের 'টাঙ্গানাইকা' আবিষ্কার।

উৎসাহভরে শিবু এবার একটু মাতব্বরী মন্তব্যের লোভ ছাড়তে পারেনি।—যা থেকে ওই দেশটার নামও টাঙ্গানাইকা। না,—ঘনাদা তাকে দমিয়ে দিয়ে বলেছেন, এখন ওই অঞ্চলের নাম হয়েছে টানজানিয়া। সে যাই হোক টাঙ্গানাইকা হ্রদ যিনি 'স্পিক' নামে আরেক বন্ধুর সঙ্গে আবিষ্কার করেন তাঁর কথাই বলি। নাম তার রিচার্ড বার্টন। নানা গুনে গুণী। একাধারে পণ্ডিত বিদ্বান তার ওপর অস্থির ছটফটে দুঃসাহসী ভবঘুরে মানুষ। সিপাই বিদ্রোহের আগেই ভারত থেকে এক বন্ধু স্পিককে নিয়ে নীলনদের উৎস সন্ধানে আফ্রিকায় চলে আসেন। তাঁর সেই অভিযানে টাঙ্গানাইকা হ্রদ আবিষ্কার করলেও এ সন্ধান ছেড়ে তিনি আরেক নেশায় মাতেন। তা হল সহস্রাধিক আরব্য রজনীর যে সব আশ্চর্য অপরূপ মুখে-মুখে– বলা কাহিনী তখন আরবী ভাষার জগতে যেহাৎ সাধারণ সরাই আর কফিখানার আড্ডাবাজ খদ্দেদের মধ্যে ছড়িয়েছিল সেগুলি সম্পূর্ণ সংগ্রহ করা। এ কাজের জন্যই তিনি সমস্ত সাহিত্য রসিক দুনিয়ার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 'স্যার' উপাধিও তিনি এজন্য পেয়েছিলেন।

একটু থেমে আমাদের কিঞ্চিৎ হতভম্ভ মুখগুলোর দিকে একবার চোহ বুলিয়ে নিয়ে ঘনাদা তারপরে বলেছেন— 'উজিজি' আসলে একটা গ্রামের নাম। ওই টাঙ্গানাইকা হ্রদেরই ধারে। আগে গ্রাম ছিল এখন শহর হয়েছে। রিচার্ড বার্টন আরবদের ক্রীতদাস যোগাড় আর চালানের এ ঘাঁটিতে গিয়েছিলেন। এবং এর পরে বিখ্যাত আফ্রিকা পর্যটক ডাঃ লিভিংস্টোনকে আরেক আফ্রিকা পর্যটক স্ট্যানলি ওখানে অসুস্থ অবস্থায় খুঁজে পান।

আগেকার চালু জার্মান ভাষা ছেড়ে ইংরেজি ধরার দায় এই অঞ্চলের বান্টু জাতেদের ওপরই পড়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ও অঞ্চলটা ছিল জার্মানদের অধীনে। জার্মানরা প্রথম যুদ্ধে হেরে যাবার পর অঞ্চলটার আসল অধিকার ইংরেজদের হাতে আসে। শিবু এ পর্যন্ত যা বলেছে তা মোটামুটি ঠিক হলেও ওই শেষের কথাটাই একেবারে ভুল। ও যাদের সোনালী গমের খামার দেখতে দেখতে উটপাখি আর জিরাফ ছোটা তেপান্তরে টাঙ্গানাইকার মিষ্টি জলের অঢেল সেচে ক্রমশঃ ছড়িয়ে যাবার কথা বলেছে সেই বোথা আর স্মাটরা আসলে কালা-ধলার আসমান-জমিন ফরা বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র বংশের লোক। জার্মানদের প্রতাপের সময় তাদের একই মেজাজ মতলবের সুযোগ নিয়ে সেই বর্ণবিদ্বেষী বুয়রদের কিছু কিছু দল ওই সোনালী মাটির দেশে খামার পত্তন করতে শুরু করে। তাদের মতলব ছিল ধীরে ধীরে এ রাজ্যটাও হাতের মুঠোয় নিয়ে এখানে তাদের নিজেদের দক্ষিণ আফ্রিকার মতো কালা ধলার ভেদের রাজ্য সৃষ্টি করে।

তারা এখানে এসে নিজেদের মতলব হাসিল করতে প্রথমে সরল কাফ্রিদের অবজ্ঞা আর কুসংস্কারের সুযোগ নেবার জন্য মোটারকম নানা ঘুষ দিয়ে ধড়িবাজ সব ওঝাদের হাত করে। এই ভূতের ওঝা বা উইচ্ ডক্টরদের সাহায্যে এ অঞ্চলের সরল বান্টুদের তারা ক্রমশঃ গোলাম বানিয়েই ছাড়ত। কিন্তু তা আর হল কই। একের পর এক তাদের খামারের সব গমের ক্ষেত শুকিয়ে ঝলসে যেতে লাগল কি যেন এক অভিশাপে। শেষে এমন হল যে, নিজেদের চাষবাস সব কিছু ছেড়ে আবার সেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় রইল না।

কিন্তু হঠাৎ তাদের খামারগুলোর এমন অবস্থা হল কেন? না জিজ্ঞাসা করে পারলাম না আমরা। চাষবাসের বিদ্যে তাদের ত ভালই জানা ছিল। অভিশাপ-টভিশাপ

গোছের কুৎসংস্কার কাটাবার মত ভুতের ওঝারাও ছিল তাদের হাতে।

—তা ছিল! ঘনাদা স্বীকার করলেন। কিন্তু ওঝাদেরও ভির্মি খাওয়ানো ক্ষ্যাপা হাতির পিঠে চড়া অমন কাঁধে—ঝোলা জড়ানো ক্ষ্যাপা অসুরের মতো ওঝাদেরও আতঙ্ক এসে সব ফসলের ক্ষেতে দেখা দেবে, আর তারপর কিছুদিন বাদে কি এক ফসলদানার মতো কুচো পোকার ঝাঁকে আকাশ অন্ধকার হয়ে যাবার পর সমস্ত ক্ষেত ঝলসে যাবে এত আর কেউ ভাবেনি।

তার মানে? আমরা একটু বিমূঢ় হয়ে বলেছি।—ওই সেরা অসুর ওঝাই এ কাজ করেছে, কিন্তু বুনো হাতির পালের একটার পিঠে চড়ে যাওয়াও ত চারটিখানি কথা নয়। বুনো হাতি বশ মানাল কি করে?

—খুব অবাক কিছু আছে কি—ঘনাদা একটু হাসলেন। প্রথম হাতি ধরে বশ মানানর বিদ্যা যিনি শিখিয়েছিলেন, সেই ঋষি পালকাব্যের দেশের মানুষের পক্ষে ও কাজ কি অসম্ভব!

—তার মানে এই আমাদের বাংলা অঞ্চলের কেউ গেছলেন ওখানে, ওঝার সেরা ওঝা হয়ে। আমাদের চোখগুলো সব বিস্ফারিত, কিন্তু অভিশাপটা ছিল কি?

—কি আর, ঘনাদা বলেছেন হেসে, থলের মধ্যে মাজরা পোকার ডিম। তখন পর্যন্ত ঝলসা রোগের বাহন এ পোকার খবর ত দুনিয়ার কাছে পৌঁছায়নি।

ঘনাদা চুপ করলেন। আমাদেরও কারুর মুখে কিছুক্ষণ আর কথা বার হল না।

এরপর কি করব এই আমাদের ভাবনা। ব্যক্তিগত কলমে 'প্রস্তুত' বলে বিজ্ঞাপন দেব একটা না এবারও চুপ করে বসে থাকব কিছুদিন, এখনও ঠিক করতে পারিনি।

আগে যা ঘটেছে

রহস্যময়ভাবে মফস্বল শহরের একটি ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়ে গেল। যে ব্যাঙ্কে সদ্য ম্যানেজারের চাকরী নিয়ে এসেছে সুশান্ত। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে, ব্যাঙ্কের তালা না ভেঙে স্ট্রংরুম থেকে ডাকাতি হয়ে গেল বহু টাকা। এটা কি করে সম্ভব? স্ট্রংরুমের তালা খুলতে হলে তো দুটো চাবির প্রয়োজন হয়—যার একটা থাকে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের কাছে, আর একটা সুশান্তর নিজের কাছে। তা হ'লে ডাকাতেরা তালা খুলল কি করে? একটু পরেই এল পুলিশ। সকলের জবানবন্দী নেওয়া হল। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও একজন ডিরেক্টর এলেন। ব্যাঙ্কের সব কর্মচারীই দোষ চাপাল সুশান্তর উপরে। সুশান্ত ভীষণ ভেঙে পড়ল। অবশেষে তার বাবার বন্ধু সতীনাথ বাবুকে কলকাতায় চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাল। সতীনাথ বাবু—ডিটেক্‌টিভই শুধু নন, বড় বৈজ্ঞানিক। ব্যাঙ্ক সুশান্তকে সাসপেণ্ড করল। এর মধ্যেই কলকাতা থেকে এলেন নতুন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মিঃ কে. সি. ত্রিবেদী।

সতীনাথবাবু হঠাৎই এসে হাজির হয়েছেন সুশান্তকে কোন খবর না দিয়েই। তবে সুশান্তকে তিনি যে জিনিস দেখালেন, তাতে সুশান্তর চিন্তা আরও বেড়ে গেছে। স্ট্রংরুমের আলমারীতে যে ছাপ পাওয়া গেছে, তা মানুষের হাতের ছাপ নয়—বানর জাতীয় কোন প্রাণীর!

সুশান্তকে নিয়ে সতীনাথ বাবু তার বন্ধু সরযূপ্রসাদের বাড়ি দেখতে এলেন। সেখান থেকে পুলিশের বড়কর্তার কাছে এসে তাঁকে ছোট্ট একটা জিনিসের ফিঙ্গার প্রিণ্ট করে দিতে বললেন। ফিঙ্গার প্রিণ্টটা কিছুটা নতুন খবর এনে দিয়েছে। কলকাতায় ফিরবার আগে মিঃ ত্রিবেদীর বাড়িতে গেলেন। সেখানে তাঁর ছদ্মবেশ কেউ ধরতে পারলেন না।

।। পনেরো ।।

সতীনাথবাবু পরদিন সকালেই কলকাতায় চলে গেলেন। বলে গেলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই আবার আসছি।

দেখতে দেখতে আরও দু'টো দিন কেটে গেল। এ দু'টো দিন সুশান্তর খুব উত্তেজনার মধ্যে কাটল। বাস্তবিক, আর কতদিন তাকে এখানে এভাবে পুলিশের নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে? সে তো নিজে জানে সে সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং জ্ঞানতঃ, এমন কোন অসতর্ক কাজ করে নি যার জন্য অত বড় একটা কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। আর তার কাছে স্ট্রং রুমের যে চাবিটা থাকত? সে তো এক মুহূর্তের জন্য সেটা হাতছাড়া করে নি। পাছে ভুলে যায় সেজন্য সেটা সর্বদা পৈতের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। পৈতে ছাড়া সে কখনও থাকে না। আর সে পৈতে সদ্‌ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ হিসেবে সে পরে না—পরে মায়ের আদেশে। আর এই বিদেশে এসে মায়ের আদেশ তাচ্ছিল্য করবে সেরকম ছেলে আর যেই হোক সুশান্ত নয়। তা ছাড়া তার জ্যেঠামশাই, যিনি নাকি একটা বড় কোম্পানীর ক্যাশিয়ার ছিলেন, বলতেন, পৈতেই নাকি চাবি রাখবার সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। চাবির গোছা নয়—সবচেয়ে দরকারী যে আসল চাবিটি সেইটি শুধু পৈতের সঙ্গে বেঁধে রাখলেই হবে। ভাগ্যিস বিধাতা তাকে জন্মসূত্রে পৈতে-ধারী হবার সুযোগ দিয়েছিলেন। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার কেন সে করবে না? অথচ সেই পৈতে থেকেই চাবি উধাও হলো! বাড়িতে তন্ন তন্ন করে সে খুঁজে দেখেছে, চাবি কোথাও খুলে পড়ে নি। পৈতেও তেমনি শক্ত আছে,—একগাছি সুতোও আল্‌গা হয়ে যায় নি যে তা ছিঁড়ে চাবি কোথাও পড়ে যাবে। তা হলে? সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে কেমন দুর্বোধ্য লাগছে। আঃ, এসময়ে যদি সরযূপ্রসাদটা কাছে থাকত, কিছু পরামর্শ নিশ্চয়ই দিতে পারত। ভারি বুদ্ধিমান লোকটা। বুদ্ধিমান্ আবার দিলখোলা। অমন বন্ধু ভাগ্যে পেয়েও কাজের সময় কোন কাজে লাগল না।

বিকেলে সুশান্ত আজ আর বাড়ি থেকে বেরুল না। ক্লাবে যাওয়া ক'দিন হলো তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। নদীর ধার ধরে মাঝে মাঝে হাঁটতে ভালো লাগত। ওপারের মহুয়া-বনের মধ্যে কেমন যেন একটা মাদকতা ছিল! কিন্তু নাঃ, আজ আর কিচ্ছু ভালো লাগছে না। কেমন একটা উদ্বিগ্ন মনটাকে ভরে রেখেছে। বাইরের বারান্দায় একটা ডেক্ চেয়ার বার করে এনে তাতে গা এলিয়ে দিয়ে সে একটা ইংরেজি ম্যাগাজিন খুলে পাতা ওল্টাতে লাগল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, মন আর যেন কিছুতেই বসতে চায় না।

সামনে দিয়ে একটা রিক্সা চলে গেল। রিক্সায় দু'জন আরোহী। দু'জনেরই সাহেবী পোশাক। সুশান্ত একবার অন্যমনস্কভাবে সেদিকে ফিরে তাকাল। পরক্ষণেই চমকে উঠল সে। আরোহীদের দু'জনকেই তো সে ভালো রকম চেনে। তাদের রিক্সা করে বেড়াবার মধ্যেও অবাক্ হবার কিছু নেই। কিন্তু অবাক্ হলো সে ঐ দু'জনকে একত্র দেখে। এরাও কি হলে অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে? কিন্তু একজন তো এ ধাতের লোক নয়! অন্ততঃ এ যাবৎ তার যা অভিজ্ঞতা।

তৃতীয় দিন সকালে এটা ওটা কাজ সেরে সুশান্তর খেয়াল হলো হাতের টাকা সব ফুরিয়ে গেছে, ব্যাঙ্ক থেকে কিছু তুলে আনা দরকার। স্নান সেরেই তাই সে পোশাক বদলে বেরিয়ে পড়ল।

ব্যাঙ্কের কাছে পৌঁছেই সে কিন্তু অবাক্ হয়ে গেল। গেটের সামনে একগাদা পুলিশ এসে জড় হয়েছে—বাড়িটাকে ঘেরাও করে ফেলেছে বললেই ঠিক বলা হয়। বেশ কিছু পুলিশের হাতে আবার রাইফেল। কিছু দূরে অসংখ্য লোক ভিড় করে আছে। বলা বাহুল্য এরা কৌতূহলী দর্শক। সম্ভবতঃ পুলিশের তাড়া খেয়ে তারা যথাসাধ্য দূরত্ব রক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ঘটনাস্থল ছেড়ে যেতেও রাজী নয় তারা। এরকম একটা ব্যাপার এই ছোট মফঃস্বল শহরে রোজ রোজই তো আর ঘটে না! শেষ পর্যন্ত না দেখে চলে যাবার পাত্র নয় তারা।

সুশান্ত কি করবে, এগোবে না ফিরে যাবে ভাবছে, এমন সময় মনে হলো একজন পুলিশ তার দিকেই এগিয়ে আসছে। অগত্যা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই।

পুলিশটি যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে জানাল, বড় সাহেব হুজুরকে সেলাম দিয়েছেন।

"বড় সাহেব? মানে থানার বড়কর্তা?"

না না, সদর থেকে বড় সাহেব এসেছেন—এস্. পি.। তিনিই ডাকছেন সুশান্তকে।

এ আবার কি নতুন ফ্যাসাদ! সুশান্ত সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে এগিয়ে এল। যেতে তো হবেই—স্বয়ং এস্. পি.-র ডাক, নিজে থেকে না গেলে হয়তো ধরে কিংবা বেঁধেই নিয়ে যাবে। মুখে বলল, "চলিয়ে।"

ব্যাঙ্কের ভিতরে উঠে এল সে। এস্. পি. সাহেব

নাকি এখানেই আছেন। কিন্তু ভিতরে এসে আশ্চর্য হলো আরও বেশি। কারণ ঢুকেই সামনের যে লোকটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো তাঁকে এখানে এ অবস্থায় দেখবার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। লোকটি আর কেউ ন'ন সতীনাথবাবু।

সুশান্তর ভাবগতিক দেখে সতীনাথবাবু ব্যাপারটা সহজেই আঁচ করে নিয়েছিলেন। খোলাখুলিভাবেই বললেন, "আজ সকলেই এসে গেছি। সোজা কলকাতা থেকে নয়, এখানকার সদরে গিয়েছিলাম এস্. পি, সাহেবের কাছে। তাঁর সঙ্গে সেখান থেকেই আসছি—একই সঙ্গে একই জীপে। আপাততঃ তাঁর সঙ্গেই সার্কিট্ হাউসে আছি, তাঁরই আতিথ্য নিয়ে। এ, আই, সি, পি, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদেরকেও খবর দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের একজন সিনিয়ার ডিরেক্টরও ইতিমধ্যে এসে গেছেন। ওঁরা পাশের ঘরে কথাবার্তা বলছেন, এখনই এসে পড়বেন। এস্. পি, সাহেব তো তোমাকে ডেকে আনবার জন্য গাড়ি পাঠাচ্ছিলেন। থানার বড় কর্তা বললেন, এইমাত্র ব্যাঙ্কের কাছেই নাকি তোমাকে দেখেছেন, তুমি হয়তো নিজের কাজে ব্যাঙ্কেই আসছিলে, তাই সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে তোমাকে ডাকিয়ে নিয়ে আসা হলো।"

সতীনাথবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই পাশের ঘরে চেয়ার নড়ার শব্দ হ'ল এবং একটু পরেই পুলিশের বড় সাহেব অর্থাৎ জেলার এস্. পি, মিঃ বাজপেয়ী ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর যিনি ঢুকলেন তাঁকে সুশান্ত আগে থেকেই চিনত। ওদের ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর সেন সাহেব। সুশান্ত যখন চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যায় তখন কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে ইনিও ছিলেন এবং সুশান্তকে বেশ কয়েকটা প্রশ্নও করেছিলেন। সুশান্তর মনে পড়ে, তার জবাব শুনে উনি যে খুশি হয়েছিলেন তাও সে বুঝতে পেরেছিল।

সেন সাহেবকে দেখে সুশান্ত উঠে দাঁড়িয়েছিল, তিনি হাত নেড়ে ওকে বসতে বললেন। তারপর হাসিমুখে বললেন, "ইয়ং বয়, তোমার ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাপ্টা গেছে। উই নো ইট্। কিন্তু জানই তো ইফ্ উইন্টার কাম্স্ ক্যান্ স্প্রিং বি ফার বিহাইণ্ড?—যদি শীত আসে বসন্তই কি বেশি পিছিয়ে থাকতে পারে? তোমারও শীতকাল সম্ভবতঃ শেষ হয়ে আসছে, বসন্তের দখিন হাওয়া এল বলে। অবশ্য এর জন্য বাহাদুরী যদি কারো থাকে তা হলে এই ভদ্রলোকের।"—বলে তিনি সতীনাথবাবুকে দেখিয়ে দিলেন।

সতীনাথবাবু কোন উত্তর দিলেন না, শুধু মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

সুশান্ত ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারল না। তবে তার জীবনে যে শীতকাল চলছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেন সাহেব কি তবে বলতে চাইছেন এতদিন পরে তার নির্দোষিতার প্রমাণ পাওয়া গেছে? তবে কি এস্. পি, যে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাতে আশঙ্কার কোন কারণ নেই?

এস্. পি, এতক্ষণ চুপ করেছিলেন, এইবার মুখ খুললেন।—"হ্যাঁ, সত্যিকার অপরাধীরা ধরা পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত স্বীকারও করেছে। অবশ্য সহজে নয়। বেশ কিছু পুলিশী দাওয়াই-এর দরকার হয়েছিল এজন্য, জট অবশ্য প্রচণ্ডই বেঁধেছিল কিন্তু সতীনাথবাবু যে ভাবে জট খুলেছেন তা ভাবা যায় না। এত বছর পুলিশে এত ওপরের পোস্টে কাজ করেও আমরা তো হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলাম।"

সতীনাথবাবু বললেন, "না না, সে কি কথা, আপনাদের,—বিশেষ করে এখনকার থানার বড়কর্তার সাহায্য না পেলে কাজটা অত সহজ হ'ত না।"

সুশান্ত আর থাকতে পারল না, অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করল, "ধরা পড়েছে? কারা ওরা? কি করে ধরা পড়ল? কোথায় আছে এখন?"

মিঃ বাজপেয়ী বললেন, "কারা? দেখলেই চিনবেন। আপাততঃ আমাদের আতিথ্যেই রেখেছি তাঁদেরকে। একজন তো আবার ঘরের লোক। কাজেই দেখাশোনার অসুবিধে হবে না নিশ্চয়ই।"

সতীনাথবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "থাক, উনি তো যথাসময়ে সব জানবেনই; ওঁকে এখন উত্তেজিত করে লাভ কি? তার চেয়ে বরঞ্চ সবাই মিলে একটু আয়েস করে চা খেয়ে নেওয়া যাক। অনেক ধকল গেছে এতক্ষণ। কোথায় হে বড়কর্তা, বলুন না আপনাদের লোকদের একটু ব্যবস্থা করতে। আর সেই সঙ্গে অনুপান হিসেবে আপনার দু'একটা নতুন কবিতা। জানেন না বোধহয় মিঃ বাজপেয়ী, আমাদের এই থানার বড়কর্তা একজন উঁচুদরের কবি।"

"তাই নাকি?—মিঃ বাজপেয়ী সকৌতূহলে বড়কর্তার খোঁজে বাইরের দিকে তাকালেন।

বড়কর্তা এতক্ষণ বাইরে দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। ওপরওয়ালার এই কৌতূহল বুঝতে পেরে সত্যি এবার লজ্জা পেয়ে গেলেন।

চা-পানের পর সবাই সবলবলে পুলিশের জীপেই রওনা হলেন থানার দিকে। অপরাধীদের ইতিপূর্বেই থানায় আটকে রাখা হয়েছিল। সুশান্ত বুঝল বড়কর্তা যখন থানা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন তখন থানার ভার এখন ছোট-কর্তার হাতে। ওঁর মত কর্মদক্ষ লোকের হাতে কাজ ছেড়ে দিলে সত্যি নিশ্চিন্ত থাকা যেতে পারে।

কিন্তু না, ছোটকর্তার চেয়ার খালি। তিনি আবার এসময়ে থানা ছেড়ে গেলেন কোথায়? কাজের দায়িত্ব একবার নিয়ে কাজে ফাঁকি দেবার লোক তো তিনি ন'ন!

সুশান্তর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি অনুসরণ করে সতীনাথবাবু বললেন, "কোথায় আবার যাবেন? এখানেই কোথাও আছেন। চল, ভিতরটা দেখে আসি।"

মিঃ বাজপেয়ী বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেতরে যাওয়া যাক। চলুন, আগে অতিথিদের দেখে আসি।"

ঠিক হাজতে নয়, তবে থানারই ভিতরে একটি সুরক্ষিত ঘরে বন্দুকধারী পাহারাদারদের জিম্মায় তিনজন লোক মাথা নীচু করে বসে আছে।

মিঃ বাজপেয়ী ইঙ্গিতে বললেন, "এই সেই মহাপ্রভুরা। হয়তো আপনার একেবারে অপরিচিত ন'ন।

সুশান্ত বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখল। হ্যাঁ, বিশ্বাস করা শক্তই বটে! খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না, সেই যে ভালো কথায় বলে "স্থাণুর মত নিশ্চল"— ঠিক সেইভাবে হতভম্বের মত সে দাঁড়িয়ে রইল।

(ক্রমশঃ)

॥ সি· এম· ডি· এ কি কি করে ॥

মহানগরীর ৫৪০ বর্গমাইল এলাকায় ১ কোটি ৩ লক্ষ লোকের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

চলাচলের সুবিধার জন্য বহু রাস্তা চওড়া হচ্ছে, ব্রীজ, ফ্লাইওভার, সাবওয়ে, বড় রাস্তা ইত্যাদি বানানো হয়েছে। বৃহত্তর কলকাতার এক বিরাট এলাকায় নতুন নালা-নর্দমা খুঁড়ে জল-মগ্নতার প্রকোপ কমাবার চেষ্টা হচ্ছে।

মহানগরীর সমস্ত বস্তীতেই পানীয় জল, পাকা রাস্তা, পাকা পায়খানা এবং বিজলীর ব্যবস্থা হচ্ছে।

তিনটি জায়গায় নতুন উপনগরী স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়েছে।

এছাড়া সি. এম. ডি.-এ নতুন প্রাথমিক স্কুল স্থাপন, বর্তমান স্কুলগুলির সংস্কার, স্বাস্থ্য প্রকল্প, উদ্যান এবং কলকাতা থেকে খাটাল সরিয়ে নতুন দুগ্ধ উপনগরীতে পুনর্বাসনের কাজ কিছু কিছু করে থাকেন।

গত দশ বছরে যে কাজ হয়েছে তার পরিচয় অনেকেই পেয়েছেন। অনেক কাজ এখনও বাকী। সব কিছু জানতে হলে অথবা সমালোচনা করতে হলে সরাসরি লিখুন।

জনসংযোগ বিভাগ, ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি. এম. ডি.এ)

৩-এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭

জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ-13

তারকমোহন দাস

আমাদের মধ্যে একজন আদর্শ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ছিলেন শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি নিজের হাতে দেখে শুনে পরীক্ষা করে বাংলার কীট-পতঙ্গ সম্পর্কে নানা রকম বিস্ময়কর তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন—সেগুলি যেমন আকর্ষণীয় তেমনিই মৌলিক। তাঁর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার জানতে ইচ্ছা হয়েছিল বিজ্ঞানের কোনো পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্য না নিয়েই অতি অল্প বয়স থেকে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে গবেষণা চালাবার বিষয়টি তিনি কিভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, দুটি জিনিস তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। তা হলো কৌতূহল—কোনো অজানা বিষয় জানবার জন্যে অদম্য কৌতূহল বোধ এবং নতুন কোনো জিনিস জানার মধ্যে গভীর আনন্দবোধ। প্রকৃতির প্রত্যেকটি জিনিস দেখার মধ্যে, জানার মধ্যে যে আনন্দ আছে তা তাঁকে বনে জঙ্গলে, মাঠে-ঘাটে ঘোরাঘুরির সময়, কোনো কিছু নিয়ে বহুক্ষণ ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় মাতিয়ে রাখত। এই কৌতূহল ও আনন্দবোধ তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

বিজ্ঞানের জগতে যারা সবে প্রবেশ করছে সেই তরুণ বিজ্ঞানীদের কাছে এই কথাগুলি খুবই দামী। বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক মুখস্ত করে হয়তো ভালভাবে পাশ করা যায়, কিন্তু তা বিজ্ঞানের গভীর জগতে প্রবেশ করতে এবং সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করে, বিস্তর বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে বারংবার পরীক্ষা চালিয়ে যেতে প্রেরণা জোগায় না। তার জন্যে আরো কিছু জিনিস দরকার হয়। বেশি কিছু নয়, তা হলো ঐ কৌতূহল ও আনন্দবোধ।

বিজ্ঞানচর্চায় মগ্ন হওয়া অনেকটা নেশার মতো। প্রথম প্রথম যে কোনো নেশাই তেমন ভাল লাগে না, পরে আস্তে আস্তে ভাল লাগতে সুরু হয় এবং শেষে পুরোপুরি মগ্ন হয়ে যাওয়া যায় ঐ নেশায়। তেমনি হাতেকলমে বিজ্ঞানচর্চার সময় প্রথম প্রথম তেমন মন বসে না, মাঠে-ঘাটে, বন-জঙ্গলে ঘোরাঘুরি কষ্টসাধ্য বলে মনে হয়। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে ঐ গাছপালা, কীট-পতঙ্গ, জীবজন্তু ও বিজ্ঞানের নানাবিধ উপকরণগুলি পরমবন্ধু ও আত্মীয়ের মতো আপন হয়ে ওঠে। তখন তার মধ্যেই নিত্যনতুন

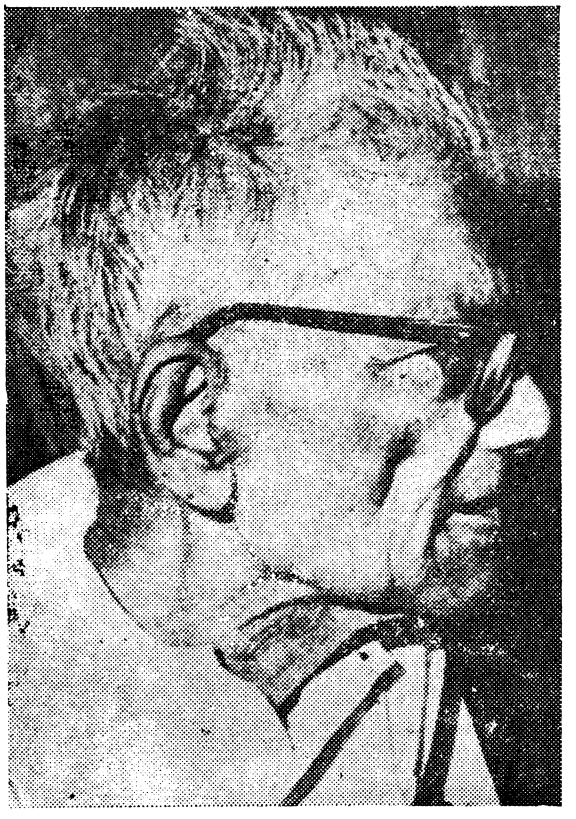

প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপাল ভট্টাচার্য

আকর্ষণের বস্তু খুঁজে পাওয়া যায় এবং গভীর আনন্দ ও তৃপ্তির স্বাদ অনুভব করা যায় ঐগুলি নিয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষার সময়। এইভাবেই বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করতে হয়।

এ পর্যন্ত গত সংখ্যাগুলিতে আমরা জীবনবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার সময় বিজ্ঞান কাকে বলে, হাতে-কলমে বিজ্ঞান চর্চার সময় বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অবলম্বন করে কেমন ভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়, পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, বাতাস, জল, মাটি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মূল ভূমিকা ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আমাদের আলোচনা নিবদ্ধ রেখে-

ছিলাম। এইবার উদ্ভিদ ও প্রাণী সে সব কাজ করে, অর্থাৎ তাদের নানারকম জীবনক্রিয়া, যার ওপর তাদের জীবন এবং সমস্ত জীবজগতের বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীল, সে সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব।

জীবজগতের সবচেয়ে প্রধান ও তাৎপর্যময় দুটি বিক্রিয়া হলো সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসন। এই সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের তাৎপর্য সম্পর্কে এই 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে'র গত দু-বছরের শারদীয় সংখ্যায় বিস্তারিতভাবে আমি আলোচনা করেছি। ঐ দুটি শারদীয় সংখ্যা অবশ্যই সংগ্রহ করে তোমরা একবার পড়ে দেখো জীবজগতের জীবনক্রিয়ার মূল প্রকৃতিই নিহিত আছে ঐ দুটি বিক্রিয়ার ওপর। সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসন বুঝতে হলে ঐ সমস্ত বিক্রিয়া যেখানে ঘটে সেই উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহকোষ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা তোমাদের অবশ্যই থাকা দরকার। কিন্তু এই কোষ বলতে কি বোঝায়, কিরকম দেখতে, তার মধ্যে কি আছে, কিভাবে তারা নানা জীবনক্রিয়ায় সাহায্য করে? এই সব প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই তোমাদের মনে জাগতে পারে এবং এই প্রশ্নগুলির উত্তরের মধ্যেই জীব-কোষ সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা তোমাদের হতে পারে।

পৃথিবীতে অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, নানারকম জীবাণু থেকে সুরু করে নানা বিচিত্র আকারের গাছপালা, কীট-পতঙ্গ ও মনুষ্যসমেত বহু রকম জীব সকলেই আজ এক সঙ্গে বসবাস করছে। তাদের আকার ও জীবনধারা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় হলেও কতকগুলি মৌল বিষয়ে তাদের মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়, যা দেখে মনে হয় তারা যেন একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ও পরস্পর নিবিড় আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় একটি উদ্ভিদের অংশ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, তা অসংখ্য ছোট ছোট বাক্সের মতো বস্তুর সাহায্যে তৈরী। এগুলিকে কোষ বলে। এই কোষগুলি জীবনের একক। পৃথিবীর সকল জীবেরই দেহ, অতি সূক্ষ্ম জীবাণু থেকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রাণী নীল তিমির দেহ অবধি, এই একই মূল উপাদান জীব-কোষ দ্বারা গঠিত। পৃথিবীতে বহুরকম উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে, যাদের দেহ একটিমাত্র কোষের সাহায্যে গঠিত। যেমন অ্যামিবা, ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি নিম্নস্তরের জীব। উচ্চ-স্তরের উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ অসংখ্য কোষের দ্বারা গঠিত। আমাদের দেহের রক্তকণিকাগুলিও এক-একটি স্বতন্ত্র কোষ ছাড়া আর কিছু নয়। এই কোষের মধ্যে জীবিত প্রোটিন প্রোটোপ্লাজম থাকে। এই প্রোটোপ্লাজমের মৌল গঠন ও রাসায়নিক প্রকৃতি পৃথিবীর সকল জীবের মধ্যে প্রায় একই।

আমরা খালি চোখে সাধারণত এক মিলিমিটারের দশ ভাগের এক ভাগের চেয়ে ছোট জিনিস দেখতে পাই না। কিন্তু অধিকাংশ জীবকোষই তার থেকে ছোট। তাই খালি চোখে তাদের দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার হয়। তবে খালি চোখে দেখা যায় এমন অনেক জীবকোষ আছে, যেমন পাখির ও অন্যান্য প্রাণীর ডিম। পাখির একটা গোটা ডিম একটিমাত্র কোষ। তুলার আঁশগুলিও এক একটি স্বতন্ত্র কোষ যার দৈর্ঘ্য হলো দু থেকে তিন সেন্টিমিটার।

উদ্ভিদকোষের চারিধারে সেলুলোজের তৈরী একটা প্রাচীর থাকে, তাকে কোষপ্রাচীর বলে। এই কোষপ্রাচীরটি মৃত। প্রাণীদের কোষের চারপাশে এই ধরনের কোনো কোষপ্রাচীর নেই। কিন্তু উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই কোষের মধ্যে যে প্রোটোপ্লাজম থাকে তার ওপর সূক্ষ্ম একটি পর্দা আছে, তাকে 'প্রোটোপ্লাজমিক মেমব্রেন' বা 'প্লাজমা মেমব্রেন' বলে। এই প্রোটোপ্লাজমিক মেমব্রেনটি জীবিত এবং এটি প্রয়োজন অনুসারে কোষের মধ্যে নানারকম পদার্থের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই দেহের যাবতীয় বিক্রিয়ায় এই প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে ঘনতম অংশের নাম নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসকে ঘিরেও একটি নিউক্লিয় মেমব্রেন আছে। নিউক্লিয়াস হলো যেন কোষের মস্তিষ্ক বা মগজ। নিউক্লিয়াস কোষের জৈবক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রোটোপ্লাজমের মধ্য থেকে নিউ-ক্লিয়াস ও অন্যান্য সূক্ষ্ম বস্তুগুলিকে বাদ দিলে যা থাকে, তা হলো সাইটোপ্লাজম। নিউক্লিয়াসের মধ্যে সূক্ষ্ম সূতার মতো ক্রোমোজোম থাকে। এই ক্রোমোজোমগুলির সংখ্যা এক এক প্রকার জীবের এক একরকম। মানুষের দেহের ক্রোমোজোম সংখ্যা তেইশ জোড়া বা ছেচল্লিশটি। এই ক্রোমোজোমগুলিই জীবের বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় বহন করে থাকে। ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান হলো ডি. এন. এ (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) এই ডি. এন. এ-ই মূলতঃ জীবের নানারকম বৈশিষ্ট্যের ধারণা ও বাহকরূপে কাজ করে থাকে।

প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে আরো কয়েকরকম সূক্ষ্ম বস্তু থাকে যার মধ্যে মাইটোকনড্রিয়ন উল্লেখযোগ্য। মাইটোকনাড্রিয়ন হলো কোষের 'পাওয়ার-হাউস', এরা শ্বসন ক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং সেই সময় যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা সাময়িক ভাবে সঞ্চয় করে রাখে। উদ্ভিদকোষে 'ক্লোরোপ্লাস্ট' নামে আর একরকম সূক্ষ্ম বস্তু আছে, যার মধ্যে সবুজ কণা বা

ক্লোরোফিল থাকে, যার জন্যে আমরা উদ্ভিদের রং সবুজ দেখি। এই ক্লোরাপ্লাস্টের মধ্যেই সূর্যরশ্মির সহায়তায় সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়াটি ঘটে থাকে এবং শর্করা জাতীয় জৈব পদার্থ তৈরী হয়—জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড নামক প্রকৃতির দুটি অজৈব পদার্থ থেকে।

উদ্ভিদের এই ক্লোরোপ্লাস্ট থেকে সবুজকণা বা ক্লোরোফিল খুব সহজেই নিষ্কাশন করা যায়। কিছু টাটকা সবুজ পাতা বা সবুজ ঘাস প্রথমে গরম জলে ফুটিয়ে নাও, তখন তাদের কোষ প্রাচীরগুলি ভেঙ্গে যাবে। তারপর ঐ পাতাগুলি একটি টেস্টটিউব বা বীকারের মধ্যে রেখে তাতে কিছু স্পিরিট বা অ্যালকোহল ঢেলে সামান্য গরম কর, তখন ঐ সবুজ কণাগুলি হু হু করে বেরিয়ে আসবে এবং স্পিরিটের রং গাঢ় সবুজ হয়ে উঠবে। স্পিরিট বা অ্যালকোহলে এই সবুজকণাগুলি সহজেই দ্রবণীয়। এই পরীক্ষাটি খুব সাবধানে করতে হয়, টেস্টটিউবে স্পিরিট গরম করবার সময় যেন আগুন ধরে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়। একটি শিশির মধ্যে ছিপি বন্ধ করে এই স্পিরিটে দ্রবীভূত সবুজকণা বা ক্লোরোফিল রেখে দেওয়া যেতে পারে। ছবি আঁকবার সময় সবুজ রঙের দরকার হলে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। অত্যন্ত চমৎকার ছবি আঁকা যায় উদ্ভিদের দেহ থেকে তৈরী এই সবুজকণা বা ক্লোরোফিলের সাহায্যে।

প্রাণিকোষের মধ্যে কোনো ক্লোরোপ্লাস্ট নেই। তাই তারা অজৈব উপাদান থেকে জৈব পদার্থ তৈরী করতে পারে না। উদ্ভিদের কাছ থেকেই জৈব পদার্থ সংগ্রহ করে প্রাণীরা নিজেদের প্রয়োজন মেটায়। ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের দেহও কোন ক্লোরোপ্লাস্ট নেই, তাদের রং সাদা, তারা অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহ থেকে জৈব পদার্থ সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে।

উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে এক বা একাধিক গহ্বর বা 'ভ্যাকুওল' আছে, যার মধ্যে জল, নানা রকম খাদ্যকণা ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থ সঞ্চিত থাকে। কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজম কখনও স্থির থাকে না। সব সময়ই ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করে, প্রোটোপ্লাজমের অন্তর্গত অন্যান্য সূক্ষ্ম বস্তুগুলিও সঞ্চরণশীল অবস্থায় থাকে। কোষের মৃত্যু ঘটলে এই সঞ্চরণ স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

এই কোষের মধ্যেই জীবদেহের যাবতীয় জটিল বিক্রিয়া ঘটে থাকে। পরিবেশের নানারকম উপাদানের সহায়তায় উদ্ভিদ-দেহে অসংখ্য জৈব পদার্থ তৈরী হয় এই কোষের মধ্যেই, সেই সঙ্গে জীবের পরিপাক, পুষ্টি, বৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধি, শ্বসন সবই ঘটে এই কোষের মধ্যে এবং কোষের সাহায্যে। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই সব জৈব বিক্রিয়ার মূল বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সকল জীবেরই এক। উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বসন, মৎস্য ও মানুষের পুষ্টি, তিমি ও ইঁদুরের সংবহনতন্ত্রে বিশেষ কোন মৌল প্রভেদ নেই। দ্বিতীয়তঃ কোষের মধ্যে এই জৈব ক্রিয়াগুলি এমন সুচারুভাবে নিষ্পন্ন হয়, যা শুধু প্রাণীর আত্মনির্ভরতায় সাহায্য করে তাই নয়, অন্যান্য প্রাণীর জীবনধারণেরও সহায়তা হয়। যেমন উদ্ভিদরা যা ফলমূল, শস্য উৎপন্ন করে, তা সংগ্রহ করে অন্যান্য প্রাণীরা জীবন ধারণ করে। আবার ঐ সমস্ত প্রাণীদের শ্বসনের ফলে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় তা উদ্ভিদের কাজে লাগে।

সুতরাং পৃথিবীর সকল জীবের মধ্যে আত্মীয়তার যে শুধু তাদের প্রোটোপ্লাজমের গঠন ও নানারকম জৈব-ক্রিয়ার সাদৃশ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়, তা আরো অর্থ-পূর্ণ, গভীরতর মাত্রায় পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। পৃথিবীর সকল জীবেরই জীবনধারণের মূল ভিত্তি গড়ে উঠেছে অন্যান্য জীবের নানারকম জৈব ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের অস্তিত্ব নির্ভর করছে অন্যের অস্তিত্বের ওপর। পৃথিবীতে কোনো জীবই স্বয়ম্ভু নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণও নয়। প্রত্যেক জীবই বহু বিচিত্র পদ্ধতিতে অন্যান্য জীবকে সাহায্য করে থাকে এবং বহু অভিনব উপায়ে অপরিমেয় সাহায্য নিয়েও থাকে, যার ফলে এই পৃথিবীতে সকলের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হয়। এই পরস্পর-নির্ভরতাও ব্যাপক অর্থে জীবনের অন্যতম মৌল বৈশিষ্ট্য।

35 বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা-19

জ্ঞানবিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ

বরুণ মজুমদার

ছোট কম্পিউটার

বর্তমান যুগটা কম্পিউটারের যুগ। কম্পিউটার যন্ত্র, মানুষের অনেক কাজ চটপট এবং খুব সহজেই করে দিচ্ছে। সবচেয়ে ছোট কম্পিউটার তৈরীর দিক দিয়ে জাপান সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। জাপানের প্রযুক্তিবিদরা এমন ছোট কম্পিউটার তৈরী করেছেন, যা একটা ব্রীফকেসের মধ্যে করে অনায়াসে নিয়ে যাওয়া যায়। তিরিশ সেণ্টি-মিটার লম্বা আর একুশ দশমিক পাঁচ সেণ্টিমিটার চওড়া এই কম্পিউটরটা খুব চটপট অনেক অঙ্কের সমাধান করে দিতে পারে। এতে এক নিমেষে অনেক প্রশ্নের সমাধান করা যায়। হাতে বহনযোগ্য পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার বলে এটাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কম্পিউটারের কাগজপড়া

এবার আর একটা মজার কম্পিউটারের কথা বলছি। এটা মানুষের মতো খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে পারে। একটা খবরের কাগজ তার সামনে রাখলে সেটা নিখুঁত ভাবে ঐ কম্পিউটার দিব্যি পড়ে দিতে পারবে। অবশ্য জাপানী ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজই ঐ কম্পিউটার পড়ে দিতে পারে। আর ঐ কম্পিউটারের স্বরটা শোনায় মেয়েদের মতো। অর্থাৎ সেটা নারীকণ্ঠের কম্পিউটার। হয়তো খুব শীঘ্রই ইংরেজি বই বা খবরের কাগজ পড়ার কম্পিউটারও তৈরী হবে। এতে অনেক অন্ধ লোকের সুবিধা হবে। অন্ধরা অনেকেই বই বা খবরের কাগজ পড়ে শোনাবার জন্যে পাঠক বা পাঠিকা নিয়োগ করেন। এই কম্পিউটার তাঁদের সমস্যায় সমাধান করে দেবে। জাপানের একটা সরকারী প্রতিষ্ঠান নিপ্পন টেলিগ্রাফ অ্যাণ্ড টেলিফোন পাবলিক কর্পোরেশন এই কম্পিউটার তৈরী করেছে।

রাজপথে সাপেদের অভিযান

সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার শহর আলমাআটাতে মহা হুলুস্থুল কাণ্ড। সর্পকুলের বিরাট অভিযান। দল বেঁধে বড় বড় বিষধর সাপেরা রাস্তায় নেমে এসেছে। তবে কি তারা কোনো দাবি আদায়ের জন্যে আন্দোলনে নেমেছে? শহরের রাজপথে যানবাহন চলাচল বন্ধ। ড্রাইভাররা গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে রীতিমত শঙ্কিত; অনেকে গাড়ি ঘুরিয়ে পেছনে ফিরে দে দৌড়। আশেপাশের এলাকায় বেশি কিছু ভেড়াও ঐ বিরাট বিরাট সাপদের পেটে চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সাপেরা রাস্তা থেকে নেমে অন্যত্র চলে গেছে। আসলে ব্যাপারটা হলো প্রচণ্ড খরার দরুন সাপেরা বনভূমি ছেড়ে ঐ শহরে চলে এসেছে। ঘটনাটা ঘটেছে গত বছর।

মাছি-ধরা উদ্ভিদ

তোমরা অনেক ধরনের উদ্ভিদের কথা জানো।

এক ধরনের উদ্ভিদ আছে, রাত্রিতে যাতে ফুল ফোটে। সেই ফুলের মধ্যে পতঙ্গ ধরবার জন্যে ফাঁদ পাতা থাকে। ফুলের আকর্ষণে মাছি আর অন্যান্য পতঙ্গ ছুটে এসে তার ওপর বসে আর সেই ফাঁদে ধরা পড়ে। আমাদের মধ্য ভারতের কয়েকটা গ্রামের ফসলের ক্ষেত আর বাগানে সাধারণত এই ধরনের উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। এর বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে 'সাত্তরোমাতাম গুচ্চাতুম'। অনেকে বলছেন, বাড়ির আশেপাশে এই ধরনের উদ্ভিদ লাগিয়ে মাছি ধরার প্রাকৃতিক কাজে একে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফলে বাড়িতে মাছির উপদ্রব কমবে।

মজার পাখী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামিতে কিছুদিন আগে চারটি পোষা পাখীকে খুঁজে বের করার জন্যে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পাখীগুলি কিন্তু যে সে পাখি নয়। শিখিয়ে পড়িয়ে এদের এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিল যে, না দেখলে তোমরা কেউই বিশ্বাস করতে পারবে না যে ওরা আসলে পাখী কিনা! পাখীগুলোর মধ্যে ছিল আফ্রিকা ও আমাজনের তিনটি তোতা পাখী এবং একটি কাকাতুয়া। আর তোতা পাখী তিনটির স্বভাব কিন্তু তিন রকমের। একটা তোতা পাখী বিড়ালকে নকল করে ডাকতে পারে। একটা কুকুরের স্বর নকল করে ডাকতে পারে। অপরটা বাঁশীর সুরে গান গাইতে পারে। কাকাতুয়াটা কিন্তু একেবারে মানুষের মতো করে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের আদর করতে পারে। ভারী সুন্দর তাদের স্বভাব। এই মজার পাখীগুলো বেশ কিছুদিন আগে চুরি হয়ে যায়। তাই পুলিশের ওপর ভার দেওয়া হয়েছিল পাখীগুলোকে খুঁজে বের করতে। পাখীগুলোর মোট দাম হবে 60 হাজার ডলারের মতো।

এখনো সেই পাখীগুলো খুঁজে পাওয়া গেল কিনা তা অবশ্য জানা যায় নি।

140 রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া—2

বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র / লেখা ও ছবি : দিলীপ দাস

সাহারার বুকে নদী

অমিতাভ সেন

মানুষ যেন এখন রূপকথার দেবতা। তার হাত এখন হাজার হাজার মিটার লম্বা। কারণ ড্রিল নামে যন্ত্রের সাহায্যে সে পৃথিবীর পেটের মধ্যে খোঁড়াখুড়ি করছে। মানুষের চোখের মণি এখন গহন রাতেও দৃষ্টিমান, লক্ষ কোটি যোজন মাইল দূরের জিনিসও তার চোখ এড়ায় না। নিশ্ছিদ্র নিরেট ধাতুর ভিতরেও অনুসন্ধান চালিয়ে মানুষ জেনে ফেলছে কোথায় কি ত্রুটি রয়েছে। আসলে মানুষ এখন যন্ত্রের সাহায্যে এমনই শক্তি অর্জন করেছে যে বর্ণালীর সাত রঙের বাইরেও বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের হেরফের ধরতে পারছে। এক্স-রে ভেদ করছে কঠিন বস্তুর আবরণ, রেডিও টেলিস্কোপে ধরা দিচ্ছে এমন নক্ষত্র যার ক্ষীণতম আলোও পৃথিবীর পিঠে পৌঁছয় না।

মানুষের তৈরি এক্স-রে যন্ত্রের চোখ 1981-র নভেম্বরে আশ্চর্য এক আবিষ্কার করেছে। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির উত্তপ্ত বালির তলায় খুঁজে পাওয়া গেছে প্রাচীন কালের নদীর ধারার অস্তিত্ব। এই আবিষ্কার অবশ্য পৃথিবীর ওপর অনুসন্ধানের ফল নয়। মার্কিন মহাকাশ-ফেরি কলম্বিয়ার দ্বিতীয় অভিযানের সময় রাডার যন্ত্রের এক্স-রে দৃষ্টি এই আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেছে। বালির নিচে হারানো এই নদী ও নদীসংলগ্ন উপত্যকা শত শত কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে আছে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিকদের মতে কোনো কোনো জায়গায় এই উপত্যকার বিস্তার নীল নদের উপত্যকার মতো। এই নদী হয়তো হাজার হাজার বছর ধরে চাপা পড়ে আছে পুরু বালির তলায়। হয়তো প্রস্তর যুগের মানুষই শেষ দেখেছিল নদীটিকে। বিজ্ঞানীদের মতে এই মরুপথে হারানো নদীটির বুকে হয়তো ন হাজার বছর ধরে সঞ্চিত রয়েছে জল।

নির্জলা সাহারার মধ্যে এই প্রাণের রুদ্ধ স্রোত আবিষ্কার করেছে 'ইমেজিং রাডার' নামে একটি যন্ত্র। মহাকাশ ফেরি থেকে পাঠানো রাডার সঙ্কেত বালির ওপর থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায় নি। বালির স্তর ভেদ করে গিয়েছিল, তারপর মহাকাশযানে ফিরল যখন এমন সঙ্কেত বয়ে আনল যার থেকে ইলেক্ট্রনিক প্রতিবিম্ব তৈরি হলো, জানা গেল বালির তলায় কি রয়েছে।

এই বিচিত্র ছবি খুঁটিয়ে দেখার পর বোঝা গেছে, এককালে সাহারায় ছিল গহন সবুজের বন। তখন বালির সমুদ্রের বুকে তপ্ত হওয়া ঢেউ তুলত না মোটেই। এখনো হয়তো সেই কালের জল সঞ্চিত হয়ে আছে ভূগর্ভের কোথাও

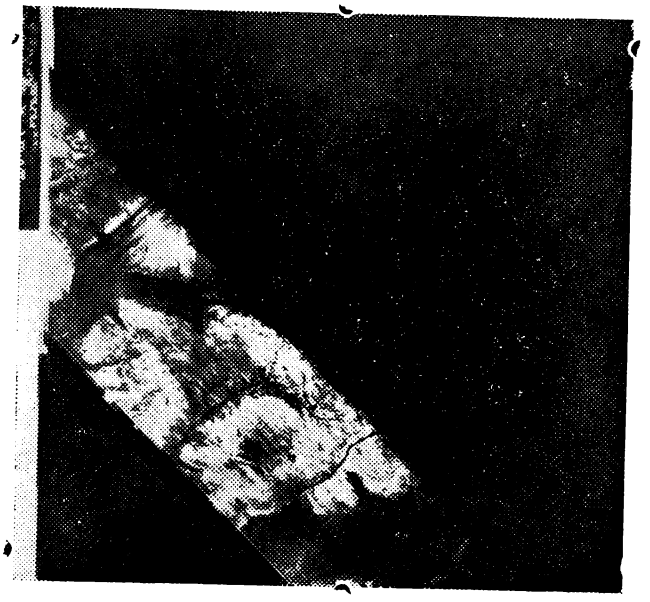

সাদা উজ্জ্বল অংশ পাথরের চাঁই, যার ওপর প্রবাহিত লুপ্ত নদী

কোথাও জলাধারের মধ্যে। হয়তো সেই জলাধারই কখনো কখনো বিশেষ কিছু মরূদ্যানের চাহিদা মেটায়। মার্কিন ও মিশরীয় বিজ্ঞানীও ছাত্রদের একটি দল তাই 48 কিলোমিটার বিস্তৃত এই অঞ্চলটি জুড়ে অনুসন্ধান চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই অঞ্চলটির অবস্থান মিশর ও সুদানের সীমারেখার উভয় পারেই। মহাকাশযানের রাডারের চোখ হয়তো ভবিষ্যতে এমন এমন জায়গায় জল ও পেট্রলের হদিশ দেবে যা কখনো ভাবা যায় নি। জল ছাড়াও বিজ্ঞানীরা এই অঞ্চলে সাহারার আদিমতম অধিবাসীদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে পাওয়ার আশা রাখেন। কারণ রাডারের ছবিতে নদীর অববাহিকায় এমন অঞ্চল ধরা পড়েছে যা এককালে মানুষের বসবাসের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তা ছাড়া বহুকাল যাবত প্রচলিত একটি তত্ত্ব অনুসারে আদিম মানুষের ক্রমবিকাশ ঘটেছিল বর্তমান সাহারা অঞ্চলের শ্যামল বনভূমিতে। তারপর আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটলে তারা ছড়িয়ে পড়ে এশিয়া ও ইউরোপে। ইতিপূর্বেও এখানে আদিম মানুষের কিছু হাতিয়ার ইত্যাদি পাওয়া গেছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এবারে আরো বেশি নিদর্শনের সন্ধান পাবেন ভাবছেন।

রাডার মারফৎ তোলা ছবিটিতে সাদা উজ্জ্বল অংশগুলি পাথরের চাঁই, যার ওপর দিয়ে প্রবাহিত লুপ্ত নদীটি। পাঁচ মিটার বালির স্তর ভেদ করে এই পাথরের ওপর ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে রাডার। আর নদীর গভীরতর উপত্যকা অঞ্চল ধরা পড়েছে কালো রঙে।

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

খুদে বৈজ্ঞানিক / লেখা ও ছবি : দিলীপ দাস

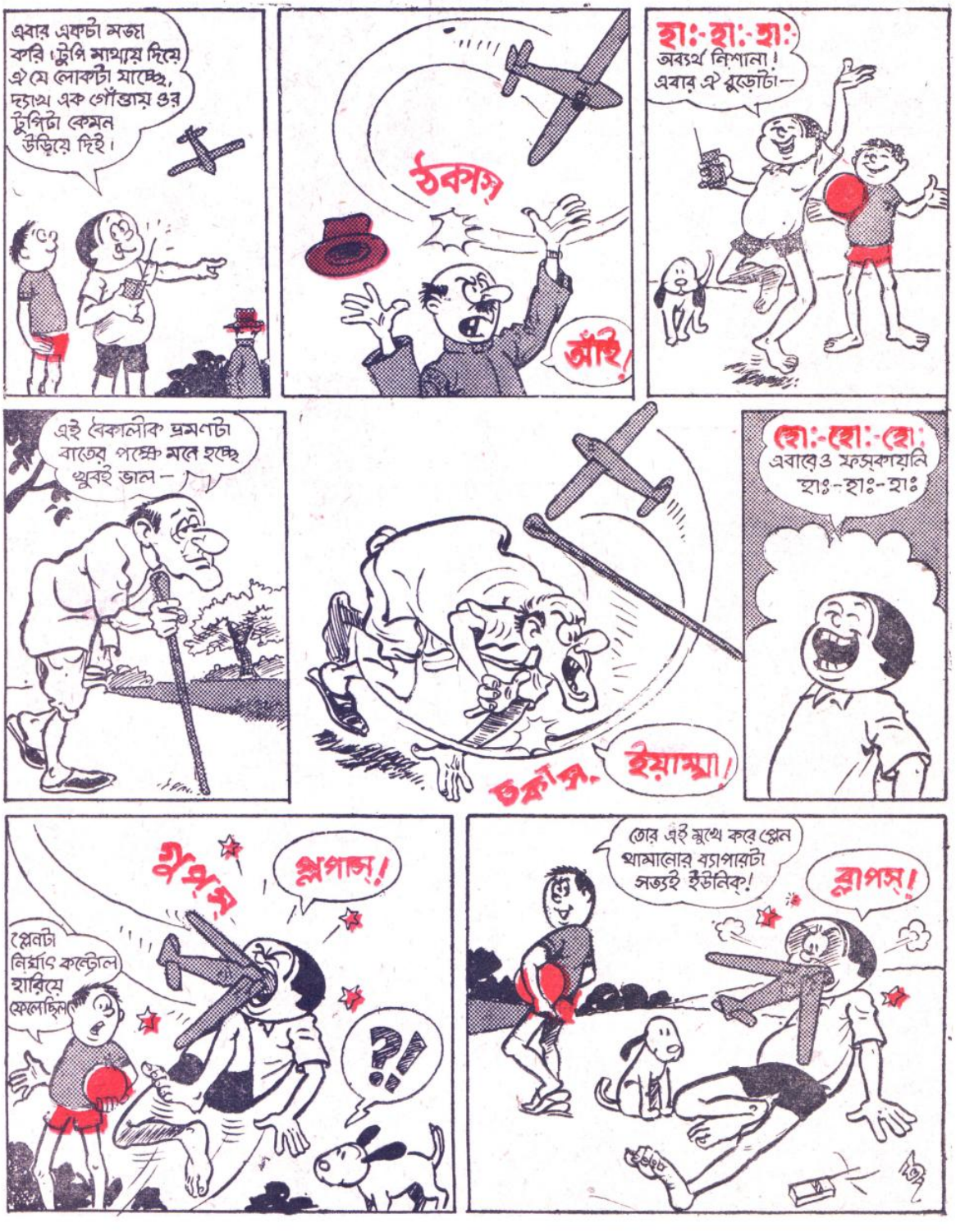

রেন সিগন্যাল

সুদীপ সেন

সেদিন সন্ধ্যায় ধোওয়া জামা কাপড় ভিজে যাওয়ায় বন্ধুর বাড়ি আর যাওয়াই হলো না টুকুনের। এমন সময় অমিতদা ঘরে ঢুকে বললেন, 'তোমরা একটা রেন সিগন্যাল বানিয়ে নাও।'

—'সেটা কি জিনিস?'

—'কখন বৃষ্টি এলো তার সংকেত।'

—'কিভাবে বানাবো?'

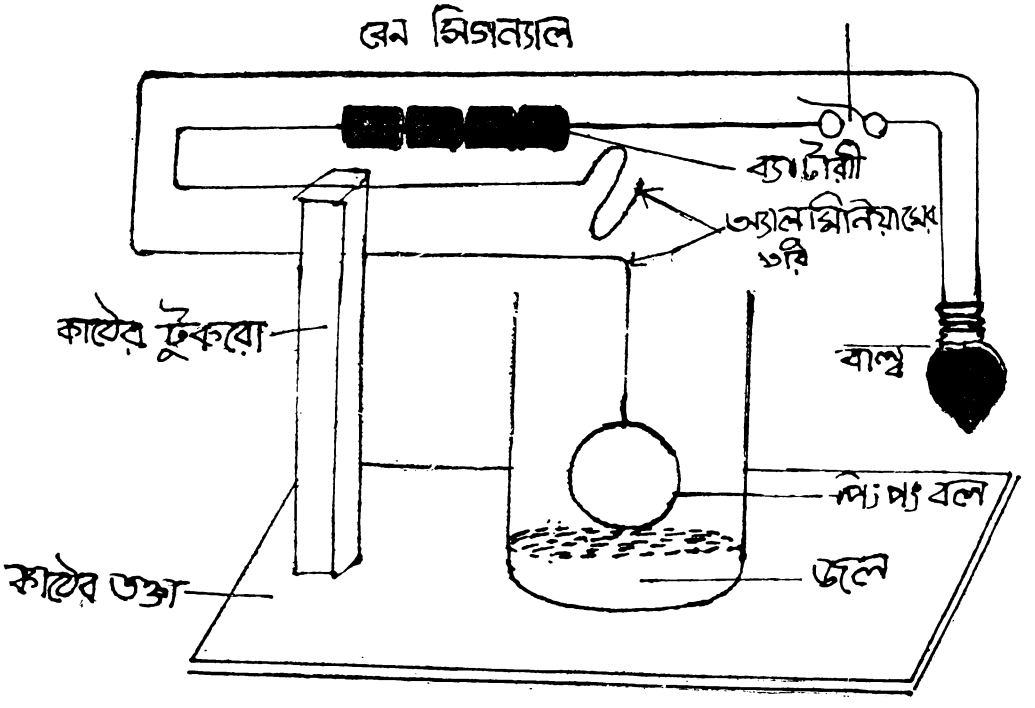

—'এইভাবে' বলে অমিতদা একটা কাগজ নিয়ে ওদের বোঝাতে লাগল। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি হচ্ছে।

(1) একটা পিংপং বল, (2) কিছুটা অ্যালুমিনিয়ামের শক্ত তার। (3) একটা 1 ফুট × 8 ইঞ্চি কাঠের তক্তা। (4) 6 ইঞ্চি লম্বা $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি চওড়া ও $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি উঁচু এক টুকরো কাঠ। (5) একটা টর্চের বাল্ব সহ হোল্ডার। (6) চারটে টর্চের ব্যাটারি। (7) কিছুটা ফ্লেক্সিবল তার। (8) একটা কৌটো। (9) কয়েকটা পেরেক (10) একটা সুইচ।

এবার প্রস্তুতপ্রণালী। অমিতদা বললেন, প্রথমে কৌটোটাকে ও তার পাশে কাঠের টুকরোটাকে লম্বাভাবে তক্তায় বসিয়ে দাও। এবার পেরেক দিয়ে লম্বাভাবে আটকানো টুকরোটার মাথায় কিছুটা অ্যালুমিনিয়াম তার বসিয়ে দাও, যাতে মাথাটা ঠিক কৌটোর ওপরে থাকে এবং মাথাটাতে একটা কুণ্ডলী থাকবে। এবার টুকরোটার পাশের দিকে একটা পেরেক আটকে দাও। অ্যালুমিনিয়াম তারের একটু করো নিয়ে এক মাথা পিংপং বলে ফুটো করে আটকে দাও ও অন্য মাথাটা ঐ পেরেকের সঙ্গে এমনভাবে আটকে দাও যাতে বলসহ তারটা সহজে ওঠানামা করতে পারে। তারটাকে বাঁকিয়ে পিংপং বলটাকে কৌটোর মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। চারটে টর্চের ব্যাটারিকে সিরিজ করে একদিক অ্যালুমিনিয়াম তারের সঙ্গে ও অন্যদিক সুইচের এক পয়েন্টে লাগাও। সুইচের বাকি পয়েন্ট হোল্ডারের একদিকে যুক্ত হবে। বাকি অ্যালুমিনিয়াম তারের সঙ্গে হোল্ডারের অন্য পয়েন্ট আটকে দাও। এবার কৌটোতে এমনভাবে জল ঢালো যাতে পিংপং বলটা ভাসতে ভাসতে ওপরে উঠে ও ওটার সঙ্গে যুক্ত অ্যালুমিনিয়াম তারটা স্থির অ্যালুমিনিয়াম তারের একটু নিচে থাকে। ব্যাটারি ও বাল্বটি ঘরে ও তক্তাসহ জিনিসগুলি কোন খোলা জায়গায় রাখো। যখনই বৃষ্টির জল কৌটোতে পড়বে তখনই বলটা আর একটু ভেসে উঠে দুটো অ্যালুমিনিয়াম তারকে লাগিয়ে দেবে ও বাল্বটি জ্বলে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা বুঝতে পারবে বৃষ্টি এলো। কিন্তু বাল্বটি তো জ্বলেই থাকবে। তাই সুইচটি অফ্ করে দাও। পরে বৃষ্টি কমলে কৌটোর জল কমিয়ে বলটাকে আগের অবস্থায় এনে সুইচটা অন করে দাও। বৃষ্টি হলে আবার আলো জ্বলবে।

T/12-A শিলিগুড়ি রেল কলোনী, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।

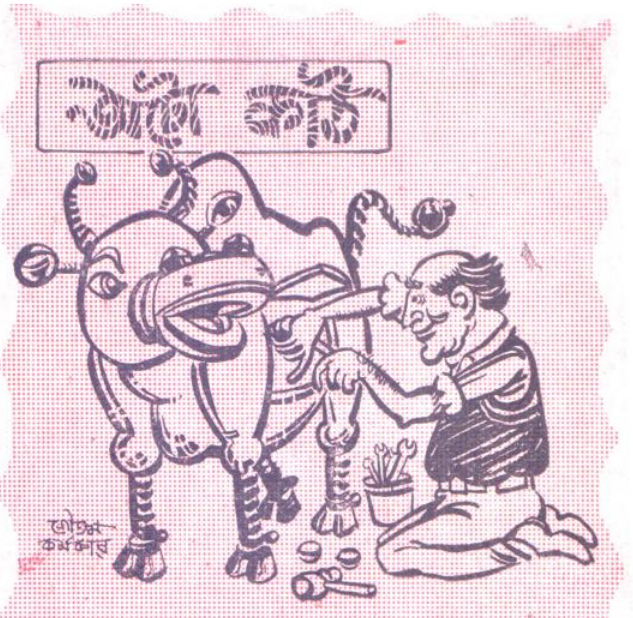

অনিল কর্মকার

কামধেনু শোনা গেছে পুরাণের গল্পে
সত্যি তা থাকলে
পৃথিবীর সব ফাঁড়া কেটে যেত অল্পে
বশিষ্ঠ মাগলে।
আসলে তা ছিল না,
তাই রব দিল না,
সার কথা বলেছেন প্রফেসর হংস—
বাংলার সলতে,
গরিবীটা রয়ে গেল, করবে কে ধ্বংস,
হয় কি তা বলতে ?
ভাবছেন প্রফেসর মানুষের
বাজারের মূল্য,
সস্তায় যদি হয় দুধ ছানা তৈরী
তার সমতুল্য
কাজ নেই মর্ত্যে
যার পরিবর্তে
নোবেল প্রাইজ তাও হয় যথাযোগ্য,
কারণ তো সত্য
দুধ ছানা দই সারা পৃথিবীর ভোগ্য
আতুরের পথ্য।
অতএব প্রফেসর কাঠ খড় পুড়িয়ে
যন্ত্রটি গড়ছেন,
দিনরাত খেটে খুটে যাচ্ছেন পুড়িয়ে
তবু যে কী লড়ছেন !
থাকবে না ভাবনা,
ভরে দিলে জাবনা,
দুধ দই ক্ষীর ছানা, নয় মোটে গল্প,
পেয়ে যাবে যতো চাও,
কাজ শেষ হতে আর দেরী আছে অল্প,
নাম হবে 'অটো কাউ'।

কবিরাজ পাড়া, বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া

কৃতী বিজ্ঞানী বীরেশচন্দ্র গুহ

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক বিজ্ঞানজগতে ভারতের নাম যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন বিশিষ্ট প্রাণ-রসায়ন বিজ্ঞানী ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহ। তিনি ছিলেন ভারতে প্রাণ-রসায়ন (বায়োকেমিস্ট্রি) গবেষণায় অগ্রণী বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের এই শাখায় তিনি যেসব নতুন তথ্য সংযোজন করেন, তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে জীবদেহে ভিটামিন-সি বা অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড উৎপাদনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার। এই বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণা বিজ্ঞান-জগতে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

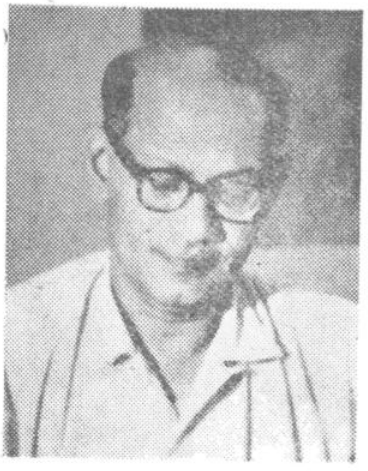

1904—1962

অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় বানরিপাড়া গ্রামের সুপরিচিত গুহ ঠাকুরতা পরিবারে 1904 সালে বীরেশচন্দ্রের জন্ম। তিনি ছিলেন রাসবিহারী গুহ'র সর্বকনিষ্ঠ পুত্র এবং স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাগিনেয়। প্রথমে বরিশালে এবং পরে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। 1919 সালে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1921 সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র থাকাকালীন তিনি অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং তারই ফলস্বরূপ কারাদণ্ড ভোগ করেন। ব্রিটিশ রাজত্বে এ ছিল এক ক্ষমাহীন অপরাধ। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ভর্তি হলেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে। সেখান থেকে তিনি বি এস সি পরীক্ষায় রসায়নশাস্ত্রের অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এস সি পরীক্ষাতেও তিনি রসায়নশাস্ত্রে প্রথম হন। 1926 সালে তিনি টাটা বৃত্তি লাভ করে বিলাতে যান এবং সেখানে পি এইচ ডি এবং ডি এস সি ডিগ্রী অর্জন করেন। স্বদেশে ফিরে এসে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অধীনে অধ্যাপনা ও গবেষণা করেন।

1936 সালে মাত্র 32 বছর বয়সে ডঃ গুহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে যোগদানের জন্যে আহূত হন এবং জীবনের শেষ-দিন পর্যন্ত ঐপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশ্য মাঝে কয়েক বছর তাঁকে ডি ভি সি-র অধিকর্তারূপে কাজ করতে হয়েছিল।

বিদেশে থাকাকালীন লণ্ডন ও কেম্ব্রিজ উভয় স্থানেই ডঃ গুহ খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিনের ওপর নানা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালিয়েছিলেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো ভিটামিন-B_1, ভিটামিন-B_2 এবং ভিটামিন-C সম্পর্কে তাঁর সার্থক গবেষণা।

ভারতে প্রাণ-রসায়ন গবেষণায় ডঃ গুহ ছিলেন পথিকৃৎ এবং এই বিষয়ে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের কথা সংশ্লিষ্ট সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন। ডঃ গুহ দেশ-বিদেশের বহু বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি সোভিয়েত রাশিয়া সহ বহু দেশ ভ্রমণ করেন। 1963 সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতিরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরম আক্ষেপের বিষয়, এই দায়িত্ব-গ্রহণ করবার কয়েক মাস আগে 1962 সালের 20 মার্চ লখনৌ-এ হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

শুধু বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় নয়, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিও ডঃ গুহর ছিল বিশেষ অনুরাগ। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর দখল দেখে সকলে বিস্মিত হতেন। একদিকে কালিদাস, অপর দিকে শেক্সপীয়র এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে তিনি নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করে কাছের মানুষদের অভিভূত করতেন। তাঁর মতো প্রাণপ্রাচর্যপূর্ণ, কর্মকুশল, মানবদরদী কৃতী বিজ্ঞানী এদেশে খুব কমই দেখা গেছে।

সুষম খাদ্য

অনন্ত ঘোষ

শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখতে হলে আমাদের বিভিন্ন প্রকারের বস্তু এমনভাবে এবং এমন পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত যাতে প্রয়োজনীয় তাপশক্তি উৎপাদিত হয়। প্রয়োজনীয় তাপশক্তি উৎপাদনক্ষম কার্বহাইড্রেট, প্রোটিন, স্নেহজাতীয় পদার্থ, খনিজ লবণ ও ভিটামিন মিশ্রিত আহার্যদ্রব্যকে সুষম খাদ্য বলে।

আমাদের এবং অন্যান্য জীবের দেহ একটি বিচিত্র বৃহৎ রসায়নাগার। আমরা প্রতিদিন যে খাদ্য গ্রহণ করি, দেহের রসায়নাগারে সেই খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে নানারূপ রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকম জৈব পদার্থ উৎপন্ন হয়। শেষ পর্যায়ে আমাদের খাদ্যের

(i) একাংশ কার্বন-ডাই অকসাইড ও জলে পরিণত হয়ে আমাদের দেহে তাপ ও শক্তি সঞ্চার করে।

(ii) একাংশ দেহকোষের গঠন ও পুষ্টি সাধন করে।

(iii) একাংশ দেহে চর্বিরূপে সঞ্চিত হয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী দেহ থেকেই দেহের খাদ্য সরবরাহ করে।

(iv) অবশিষ্টাংশ অসার এবং অপ্রয়োজনীয় পদার্থ হিসাবে মল-মূত্র ও ঘর্মরূপে দেহের রসায়নাগার থেকে নির্গত হয়ে যায়।

খাদ্যবস্তুতে অন্তর্নিহিত তাপশক্তির মাত্র এক ষষ্ঠাংশ মানুষ কাজে পরিণত করতে পারে। সুতরাং যে লোকের 500 ক্যালরি তাপশক্তির প্রয়োজন, তাকে এমন খাদ্য-বস্তু গ্রহণ করতে হবে যা তার প্রয়োজনের 6 গুণ অর্থাৎ $500 \times 6 = 3000$ ক্যালরি তাপশক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম। বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যবস্তুর তাপসৃষ্টির ক্ষমতা বিভিন্ন। এক গ্রাম কার্বহাইড্রেট ও প্রোটিন থেকে 4 ক্যালরি এবং এক গ্রাম চর্বি হইতে 9 ক্যালরি তাপ সৃষ্টি হয়। এই হিসাবে একজন লঘু শ্রমকারী পূর্ণবয়স্ক লোকের জন্যে 2700--2800 ক্যালরি মূল্য অনুযায়ী দৈনিক খাদ্যের প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম হলেও একই প্রকারের খাদ্য প্রত্যহ গ্রহণ করা উচিত নয়। এতে পরিপাকতন্ত্রের বিঘ্ন ঘটে।

বিভিন্ন বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ অনুসারে ক্যালরির প্রয়োজনীয়তা নিম্নে দেওয়া হলো।

ক) বালক 12 থেকে 15 বছর 2400 ক্যালরি
তরুণ 15 ,, 21 ,, 2400 ,,

খ) নারী লঘু শ্রম মধ্যম শ্রম কঠোর শ্রম
2100 ক্যাঃ 2500 ক্যাঃ 3000 ক্যাঃ

গ) পুরুষ লঘু শ্রম মধ্যম শ্রম কঠোর শ্রম
2400 ক্যাঃ 3000 ক্যাঃ 3600 ক্যাঃ

ক্যালরি মূল্য অনুযায়ী দৈনিক খাদ্যরূপ ঃ

খাদ্যবস্তু	আউন্সে ওজন (100 গ্রাম = 3·5 আউন্স)	ক্যালরি মূল্য
প্রোটিন	3·5	406
স্নেহ জাতীয়	3.5	920
কার্বোহাইড্রেট	1·2	1392
		2718 ক্যালরি

প্রোটিন বা কার্বোহাইড্রেট খাদ্যদ্রব্য = প্রতি আউন্সে 116 ক্যালরি

স্নেহজাতীয় খাদ্যদ্রব্য = প্রতি আউন্সে 263 ক্যালরি

মধ্যবিত্ত বাঙালীর জন্যে একটা সুষম খাদ্যতালিকা ঃ

কলে ছাঁটা চাল	10 আউন্স	ঘি	1 আউন্স
ডাল	3 ,,	দুধ	8 ,,
তরকারী	6 ,,	চিনি	2 ,,
শাকসব্‌জি	4 ,,	মাছ	2 ,,
		তেল	2 ,,

এই খাদ্যসমূহের তাপ-মূল্য 2650 ক্যালরি।

30 ব্যানার্জী লেন, রানাঘাট, নদীয়া

হংসচঞ্চু

অজয় হোম

পৃথিবীতে কত সবই না অদ্ভুত জীবজন্তু আছে। তাদের পরিচয় পেলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়! এখনও এরা পৃথিবীর বুকে টিকে আছে। এইরকম ছটি বর্গের প্রাণী এখনও অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে একটি বর্গের প্রাণী হচ্ছে সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ীতে উত্তরণের প্রথম পদক্ষেপ। তাদের একটি প্রজাতির নাম —হংসচঞ্চু, ইংরেজি—ডাকবিল, প্লাটিপাস।

প্লাটিপাস

দেহ গোলাকার, লম্বায় প্রায় 61 সেমি, তার মধ্যে চ্যাপটা লোমশ লেজ প্রায় 15 সেমি। ওজনে প্রায় 2 কেজি পর্যন্ত হয়। পা বেঁটে, আঙুল 5টি তীক্ষ্ণ নখর-যুক্ত। সামনের পায়ে নখের মাঝে হাঁসের মতো ঝিল্লি দিয়ে জোড়া। সেই ঝিল্লী নখ ছাড়িয়ে সাঁতার কাটার সময় তার প্রয়োজন। পিছনের পায়ে ঝিল্লি নেই। ঠোঁট হাঁসের মতো দেখতে বটে, তবে পাখির চঞ্চুর মতো শিং-এর উপাদানে গঠিত নয়। কোন স্তন্যপায়ীর নাক ও ঠোঁট টেনে চ্যাপটা ও লম্বা করলে যেমন হয় তেমনি নরম চামড়ার, দেখায় যেন রবারের। দেখলে মনে হয় অন্য কোনও প্রাণীর এই অদ্ভুত চঞ্চু বা ঠোঁট এনে অস্ত্রোপচার করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ওই ঠোঁট অসংখ্য সূক্ষ্ম অনুভবসম্পন্ন স্নায়ুতে ভর্তি। জলের তলায় বন্ধ চোখে খাদ্য খোঁজার সময় ওই ঠোঁটের সামান্যতম স্পর্শ দিয়েই

সামনের ঝিল্লী জোড়া পা

খাদ্যকে অনুভব করতে পারে। উপরের ঠোঁট বেগুনি-কালো, নিচের ঠোঁটে হলদে ও কালোর ছোপ। অন্যান্য পশুদের মতো কাণ বাইরে বের করা নয়, পাখিদের মতো মাথার দুপাশে লোমের ভিতর ছোটো ছাঁদা। চোখ খুব ছোটো। জলের ভিতর যখন চলে বা সাঁতার দেয়, তখন চোখ ও কাণের উপর পর্দা পড়ে ঢেকে যায়। গায়ের লোম মোটা, নরম ও পশমী। পিঠের রঙ গাঢ় বাদামী, বুক ও পেটের লোম ধূসর-সাদা থেকে হলদে। পুরুষের পিছনের দুপায়ে লড়াইয়ে মোরগের নখের মতো ফাঁপা শিং আছে যা বিষগ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত। কেবল আত্মরক্ষার্থে এর ব্যবহার হয়। এই বিষে মানুষ মরে না, কিন্তু একটা কুকুর মারা যেতে পারে। স্ত্রীজাতির এই নখ ও বিষগ্রন্থি থাকে না। শিশুকালে হংসচঞ্চুর উপরের চোয়ালে দু' বা তিন জোড়া ও নিচের চোয়ালে দু'জোড়া দাঁত থাকে। পরে বড়ো হলে এই দাঁত শক্ত শিং-এর মতো রূপ নেয়।

বাসস্থান—পূর্ব ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া এবং টাসমানিয়ার ছোটবড়ো নদীতে। বেশির ভাগ সময় জলে থাকলেও একনাগাড়ে এক থেকে পাঁচ মিনিটের বেশি জলে ডুবে থাকতে পারে না। আগে এদের 'জল-ছুঁচো' বলা হত।

হংসচঞ্চুরা নিশাচর। নদীর পাড়ে গর্ত খুঁড়ে বাস করে। তবে গর্তের মুখ জলের ধারে এবং জল থেকে একটু উঁচুতে। কখনওবা গর্তের মুখ জলের ভিতর তাও দেখা যায়। এদের স্বভাব সদাই অস্থির এবং প্রাণচঞ্চল। এক মুহূর্ত স্থির থাকে না।

খাদ্য—জলজ পোকামাকড় ও অন্যান্য ছোট মেরুদণ্ডহীন প্রাণী। যেমন, শামুক, কাঁকড়া, চিংড়ি ইত্যাদি। খায় প্রচুর, দেহের ওজনের অনুপাতেই দৈনিক আহার। জলের তলায় খাদ্য সংগ্রহ করে ডাঙায় উঠে এসে গলাধঃকরণ

করেই আবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সবচেয়ে সক্রিয় হয় প্রত্যুষে এবং সন্ধ্যায়। তখন দেখা যায় নিঃশব্দে জলে ডুব দিয়ে সাঁতার কাটতে। জলের উপর হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে খানিক ভেসে চলে আবার ডুব দেয়। শীতকালে অল্প কয়েকদিনের জন্যে শীতঘুমও দেয়।

প্রজননকাল আগস্ট থেকে নভেম্বর। জলেই মিলন সংঘটিত হয়। প্রাকমিলনের দৌড়ঝাঁপ নানা কায়দায় হয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে পুরুষ স্ত্রীর লেজটিকে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে ওই অবস্থায় দুজনে ঘুরে ঘুরে সাঁতার কাটে।

বাসস্থানের গর্ত উপরের জমি থেকে 30 সেমি নিচের মধ্যে থাকে, কিন্তু লম্বায় দেখা গেছে 18 মি পর্যন্ত। এই লম্বা গর্তের মধ্যে থাকে অনেক শাখাপ্রশাখা। একটি শাখা যা সবচেয়ে বেশি আঁকাবাঁকা তার শেষে প্রসূতি-আগার। এই কক্ষটিতে ঘাস ও ইউকালিপটাসের পাতা বিছানো। ডিম পাড়তে যাবার সময় লেজ দিয়ে মাটি নাড়িয়ে পথ বন্ধ করতে করতে তার প্রসূতি-আগারের দিকে যায়। গর্ভধারণের সময় 15 দিন। ডিম পাড়ে সাধারণত 2টি, কখনও 1টি, ক্বচিৎ 3টি। ডিম অনেকটা চড়াইপাখির ডিমের মতো, লম্বায় 16 থেকে 18 মিমি, চওড়ায় 14 থেকে 15 মিমি। সাপের ডিমের মতো নরম চামড়ার, দোমড়ানো যায় এবং রঙ সাদাটে। তলপেটের নিচে ডিম রেখে তা দিয়ে 8 থেকে 10 দিনেই বাচ্চা ফোটায়। সদ্যপ্রসূতের গায়ে লোম থাকে না, চোখ বন্ধ। মা-হংসচঞ্চুর পেটের উপর খুব ছোটো ছোটো ছাঁদা দিয়ে (বোঁটা নেই) দুধ ক্ষরণ হয়, সেই দুধ বাচ্চা চেটে খায়। 11 সপ্তাহে চোখ ফোটে। 4 মাস পূর্ণ হলে মা বাচ্চাকে জলে নামায়।

হংসচঞ্চুরা 10 থেকে 15 বছর বাঁচে। শরীরের উত্তাপ মোটামুটি 32·2° সে। ক্বচিৎ গলা দিয়ে মৃদু গোঙানির মতো আওয়াজ বার করে। বয়স্ক পুরুষের গায়ে প্রায় শেয়ালের গায়ের বোঁটকা গন্ধের মতো। ঘাড়ের শেষপ্রান্তে অবস্থিত গ্রন্থি থেকে এই গন্ধ বার হয়।

বীবরের মতো নরম পশমী লোম ও চামড়ার জন্যে এদের আগে খুবই হত্যা করা হতো। তার ফলে এই অদ্ভুত স্তন্যপায়ীটির প্রায় লুপ্ত হবার দশা ঘটে। বর্তমানে আইন করে এদের রক্ষা করার বন্দোবস্ত হয়েছে।

8/1 ডঃ বীরেশ গুহ স্ট্রীট, কলিকাতা-17

জানা অজানা

কল্যাণ সাহা

প্রকৃতির সবচেয়ে বড় ফুলের সবচেয়ে বেশি দুর্গন্ধ। এই ফুলের নাম হচ্ছে RAFELESIA (র‍্যাফলেশিয়া), জন্মায় ম্যালেশিয়ায়। এক একটি ফুলের ওজন প্রায় 7 কিলোগ্রামের মতো।

হিমালয়ের নানাস্থানে প্রচুর রোডোড্রেনড্রন ফুলের গাছ দেখা যায়। তিব্বতের মালভূমিতে এই গাছগুলির এক একটা দৈত্যাকার ধারণ করে, মানে 25-30 মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়।

আল্পসের পাদমূলে একরকম ছোট গাছ জন্মায়, যার নাম SOLDANELLA। এগুলো যখন তুষারের নিচে চাপা পড়ে যায় তখন বাইরের আলোহাওয়া পাবার জন্যে এরা নিজেদের শরীরের উত্তাপকে তুষার গলানোর কাজে লাগিয়ে পথ করে নেয়।

দক্ষিণ আমেরিকার MARTYNIAS গাছে যে ফল জন্মায় সেটার গায়ে লাগানো থাকে 15 থেকে 18 সেন্টি-মিটার লম্বা বঁড়শীর মত কাঁটা, কখনও কখনও এই কাঁটা জীবজন্তুর গায়ে ফুটে গিয়ে তাদের মৃত্যু ঘটায়।

দাবানল যে কত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়তে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে MIRAMICHI-র (MAINE) জঙ্গলে। ওখানে 1825 সালের 7 অক্টোবর যে দাবানল জ্বলে উঠেছিল সেটা মাত্র 6 ঘণ্টায় 120 মাইল ছড়িয়ে পড়েছিল, আর 160 জন লোক পালাতে না পেরে প্রাণ হারিয়েছিল।

সবচেয়ে বেশি লোক মরেছিল 1871 সালের PESHTIGO (WISCONSIN)-এর দাবানলে। মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় 1152 জন। আর 12,80,000এ কর জঙ্গল এই দাবানলে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

আমাজনের লিলি ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার, পাতার ব্যাস প্রায় 3 মিটার। একটি ভাসমান পাতা না ডুবে অক্লেশে একটি ছোট ছেলের ওজন বইতে পারে।

ঘোষপুর ইউনিয়ন নেতাজী বিদ্যাপীঠ

সোনার সন্ধানে

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সভ্যতার সেই প্রাচীন যুগ থেকে মানুষ ছুটেছে সোনার পেছনে। এর অপরূপ হলুদবর্ণ, অকলুষ স্নিগ্ধ রূপে মানুষ মুগ্ধ। ইতিহাস সাক্ষী দেয়, সারা পৃথিবীতে সোনার খনি খুবই প্রাচীন, খ্রীষ্টজন্মের প্রায় 2000-2500 বছর আছে থেকেই সোনার খনির কাজ শুরু হয়েছে। অবশ্য পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব 3000 থেকে 2500 সালের মধ্যে মিশরে সোনার খনির পত্তন হয়েছিল। আর সেই সোনার আকরিক থেকে নিষ্কাশিত হত সোনা।

ভারতবর্ষেও খনি থেকে সোনা উত্তোলনের ঘটনা খুবই পুরনো। কেননা হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ, ঋক বেদ পুরাণ, মহাভারত এবং রামায়ণে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও সোনার খনির অবস্থান, সময়, উৎপাদনের পরিসংখ্যান বা খনির আধিকারিকের নামধাম বিশেষ কিছুই জানতে পারা যায় না। তাই ভারতে সোনা উত্তোলনের ইতিহাস অনেকটাই অনুদ্‌ঘাটিত থেকে গেছে। কিন্তু বিখ্যাত রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির বিবরণে লেখা আছেঃ 'নায়ারদের দেশে কাপিতালিয়া পর্বতের অপর পারে সোনা ও রূপোর শিরা উত্তোলনের কাজে ভারতীয়দের দেখতে পেয়েছি।' অনেকের ধারণা, কাপিতালিয়া পর্বত বলতে আবু পর্বতকে বুঝিয়েছেন উনি। এবং জায়গাগুলো সম্ভবত হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর প্রদেশের ভেতরে। সে যাই হোক, করনাটকের কোলার স্বর্ণখনি ও বিহারের সোনার খনির অঞ্চলগুলিতে ছড়ানো গলানো পাথরের পিণ্ড দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না, এসব জায়গায় সুদূর অতীতে একদিন সোনা উত্তোলনের কাজ চলত বিরামহীন ছন্দে। সেই সুদূর অতীতে ভারতীয় পূর্বপুরুষরা হুট্টি সোনার খনিতে 200 মিটার এবং কোলার সোনার খনিতে প্রায় 90 মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনির জাল বিছিয়ে দিয়েছিলেন। এসব ভূগর্ভস্থ খনি দেখলে একথা সূর্যের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সে যুগের খনিকাররা তথাকথিত আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই কী অসম্ভব দক্ষতায় মাটির নিচে সোনার খনির গোড়াপত্তন করেছিলেন। ঐতিহাসিক ও পুরাবিজ্ঞানীদের ধারণা, খনি থেকে সোনা উৎপাদনের কাজকর্ম চলে খ্রীষ্টপূর্ব 1000 সাল পর্যন্ত। তারপর অজ্ঞাত কোন কারণে খনিগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। অনেকের ধারণা, ভারতের বাইরে থেকে শক্তিশালী বহিঃশত্রুর আক্রমণই এর কারণ। অথবা এমন হওয়া অসম্ভব নয়, ভূগর্ভস্থ খনি থেকে সোনা খুঁড়তে খুঁড়তে খননের কাজ এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল, যার পর আরো গভীরে এগিয়ে যাওয়া সে যুগের সীমিত যান্ত্রিকতায় আর সম্ভব হয়নি। প্রায় আড়াই হাজার বছরের নিষ্ক্রিয়তার পর বিজয়নগরের রাজত্বকালে ষোড়শ শতাব্দীতে সোনার উত্তোলন আবার শুরু হয় তৎকালীন মহীশূর রাজ্যে। এর-পর ঊনিশ শতক থেকে সোনা উত্তোলনের ব্যাপারে ভারতে নতুন উদ্দীপনার শুরু। বলতে গেলে সেই দিন থেকেই আধুনিক পদ্ধতিতে সোনা উত্তোলনের কাজ আরম্ভ হয়।

সোনা প্রধানতঃ ব্যবহার হয় অলঙ্কার নির্মাণের কাজে

সোনার মূল্য অথবা প্রয়োজন কী, সে কথা কাউকে বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। তা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই জানা। নারীর দেহের অলংকার ছাড়াও আন্তর্জাতির পর্যায়ে লেনদেনের ব্যাপারে সোনাই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

এজন্য প্রত্যেক দেশের রিজার্ভ ব্যাংকে প্রচুর পরিমাণ সোনা মজুত থাকে। শাড়িতে জরির কাজের জন্যে সোনার সুতোর ব্যবহার খুবই চালু। চিকিৎসাবিজ্ঞানেও সোনার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। সোনা এবং রূপার মিশ্র ধাতু মাথার খুলিতে চোট সারানোর কাজে লাগে। এছাড়া 'গোল্ড ক্যাপসুল' ও 'গোল্ড ইনজেকশন' হাড়ের বাত, যক্ষ্মারোগ ও ক্যানসার নিরাময়ে ফলদায়ক। দাঁতের গর্ত ভরাটের ব্যাপারেও সোনার খুব চাহিদা। খুব দামী চীনা-মাটির বাসনপত্র চিত্রিত করবার কাজে সোনার জল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মেয়েদের গয়নার ব্যাপারে সোনা ব্যবহারের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গয়না ইত্যাদি তৈরির ব্যাপারে সারা ভারতে আজ পর্যন্ত প্রায় 35 লক্ষ কিলোগ্রাম সোনা ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রকৃতিতে পুরোপুরি খাঁটি সোনা পাওয়া যায় না। প্রায়ই মাঝে মাঝে অন্য ধাতুর সঙ্গে মিশ্র ধাতু অথবা যৌগিক পদার্থ হিসেবে সোনার আকরিকের অবস্থিতি। যেমন, সোনা ও রূপার মিশ্র ধাতু আরজেণ্টিনিয়ানে রূপার ভাগ 10 থেকে 15 ভাগ। প্যালাডিয়ান সোনা ও প্যালাডিয়ামের মিশ্র ধাতু। ক্রেনেরাইট—সোনার ডাই-টেলুরাইড, সঙ্গে থকে সামান্য রূপো (Au, Ag) Te_2। কিউপ্রিয়ান—সোনা এবং তামার মিশ্র ধাধু ($Au\ Cu_3$)। অরোস্টিবাইট, সোনা ও অ্যানটিমনির মিশ্র ধাতু ($Au Sb_2$)। এতে সোনার পরিমাণ শতকরা 43·5 থেকে 50·9 ভাগ। সিলভ্যানাইট সোনা ও রূপোর ডাইটেলুরাইড (Au Ag Te_4)। এতে সোনার পরিমাণ শতকরা 24·25 থেকে 29·9 ভাগ। প্রকৃতিতে নানা ধরনের পাথরের মধ্যেই সোনার অবস্থান। আগ্নেয়শিলা, পাললিক শিলা অথবা রূপান্তরিত শিলা—সব ধরনের পাথরেই সোনার সন্ধান পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, মহাকাশ থেকে ছুটে আসা উলকাপিণ্ডের ভেতর থেকে মিলেছে ঈপ্সিত সোনা। জোনসের একটি পরীক্ষা থেকে জানা যায়, সাধারণ আগ্নেয় পাথরের এক লক্ষ কোটি ভাগে গড়পড়তা প্রায় 3 ভাগ সোনা পাওয়া যায়. যদিও কখনো কখনো এতে সোনার ভাগ 73 হতে পারে।

উৎপত্তিগত দিক থেকে সোনার আকরিক দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রয়েছে পাথরের বুক চিরে জমে থাকা সোনাবাহী শিরা, দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে নদীবাহিত সোনা, যা কোন কোন নদীর বালির সঙ্গে মিশে থাকে। ভূবিজ্ঞানীদের মতে, প্রথমোক্ত শ্রেণীর সোনার উৎপত্তি গলিত আগ্নেয়শিলা বা ম্যাগমা থেকে। নদীবাহিত সোনার উৎপত্তিও কিন্তু আসলে সোনা মিশ্রিত আগ্নেয়-শিলা থেকে। রোদ, বাতাস ও বৃষ্টির স্পর্শে পাথর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে মিশে যায় নদীর বালির সঙ্গে। নদীর জলের সঙ্গে বহু দূরের পথ পেরোতে পেরোতে বালিতে সোনার ভাগ বাড়তে থাকে। এভাবেই ধীরে ধীরে তৈরি হয় নদী বাহিত সোনার ভাণ্ডার। নদীর পারের গাঁয়ের লোক কাঠের গামলায় বালি আর জল নিয়ে শুধু হাতের কৌশলে বালি থেকে আলাদা করে ফেলে সোনা।

ভারতে এই দু'ধরনের সোনার আকরিক পাওয়া যায়। অবশ্য উৎপাদনের দিক থেকে খনিজ সোনাজাত শিরাই প্রধান। প্রকৃতিতে এই সোনা সাধারণত মিশে থাকে কোয়ার্টজ শিরার সঙ্গে। অধিকাংশ ভূতাত্ত্বিকের মতে, কোয়ার্টজ শিরার জন্ম আগে পরে এই শিরার ফাটলে এবং ফোকরে জল ও তাপের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সোনার জন্ম।

ভারতের প্রধান স্বর্ণখনিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য (1) কোলার স্বর্ণক্ষেত্র, কর্ণাটক (2) হুট্টি স্বর্ণক্ষেত্র, কর্ণাটক, (3) অনন্তপুর স্বর্ণক্ষেত্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, (4) গাদাক স্বর্ণক্ষেত্র কর্ণাটক, (5) ওয়াইনাদ স্বর্ণক্ষেত্র, তামিলনাড়ু। এছাড়া রয়েছে আরো কিছু সম্ভাবনাময় স্বর্ণক্ষেত্র যেখানে হয়তো ভবিষ্যতে বড় সোনার খনি গড়ে উঠতে পারে এবং কয়েকটি নদীর বালিতে মিশে আছে সোনা, যা এখনো পর্যন্ত ভারতে কুটিরশিল্পের পর্যায়ে রয়েছে।

কোলার স্বর্ণক্ষেত্র—ব্যাঙ্গালোর থেকে 100 কিলো-মিটার দূরে কোলার অঞ্চলে সিস্ট জাতীয় পাথরের ভেতরে এই স্বর্ণখনির অবস্থান।

ওয়ারেনের প্রাচীন বিবরণ পড়ে জানা যায়, প্রায় দু'শো বছর আগে টিপু সুলতানের আমলেই এখানে প্রথম সোনা উত্তোলনের কাজ শুরু। 1802 সালে ওয়ারেন সাহেব এই অঞ্চলে প্রথম বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালান, এরপর ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করেন লাভেল সাহেব 1871 সালে। লাভেল সাহেবের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই বেশ কয়েকটি দেশী-বিদেশী কোম্পানি গজিয়ে ওঠে। 1839 সালে চ্যাম্পিয়ন রীফ কোম্পানি কাজ শুরু করে এবং 3095 মিটার গভীরতায় চ্যাম্পিয়ন স্বর্ণ আকরিক থেকে সোনা বের করে। কিন্তু ভারতের এই গভীরতম খনি বন্ধ করে দিতে হলো শিলাচ্যুতির ফলে। এসব কোম্পানিগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলো 1956 সালের নভেম্বর মাসে।

কোলার স্বর্ণক্ষেত্রের অধিকাংশ সোনাই পাওয়া গেছে চ্যাম্পিয়ন লোড (lode) থেকে, যার দৈর্ঘ্য 8 কিলো-মিটারের মতো এবং গড়পড়তা প্রায় 750 মিটার গভীরতায় এর কাজকর্ম চলেছে। চ্যাম্পিয়ন লোড ফুরিয়ে যাবার পর

পশ্চিম রীফ ও ওরিয়েনটাল লোডে কাজ শুরু হয়। তবে মাঝে মাঝেই কাজ বন্ধ থাকে প্রযুক্তিগত কারণে।

হুট্টি স্বর্ণক্ষেত্র—কর্ণাটকের হুট্টি সোনাক্ষেত্রের অবস্থান রায়চুর থেকে 80 কিলোমিটার দূরে হুট্টি গ্রামের কাছে। এই সোনাক্ষেত্রে 80 কিলোমিটার দীর্ঘ সিস্ট শিলাস্তরের বুকে অবস্থিত। এই অঞ্চলে যে সোনার খনিগুলি রয়েছে, তাদের নাম মাসকি, বুদিনী, টোপালদোদী, ওয়ানভালি, কাদোনী এবং উদবাল।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই হুট্টি সোনাক্ষেত্র থেকে সোনা উত্তোলিত হত। এ অঞ্চলে খনির গভীরতা প্রায় 195 মিটার পর্যন্ত ছিল এবং সে যুগের যান্ত্রিক কুশলতার কথা চিন্তা করলে এই খনিখাদ খননকে মোটামুটি অভূতপূর্ব বলা যায়। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত খনিখাদ থেকে জল নিষ্কাশন করবার প্রয়োজন এত প্রবল হয়ে দাঁড়ায় যে খনিখাদ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

বর্তমানে হায়দ্রাবাদ গোল্ড মাইনস কোম্পানি লিমিটেড এখানে সোনা উত্তোলনের কাজে নিয়োজিত। 1948 সাল থেকে শুরু করে 1967 সালের মধ্যে সোনার উৎপাদন দাঁড়িয়েছে 19,250 কিলোগ্রাম (এর মধ্যে 1897 সাল থেকে 1920 সালের হিসেবও ধরা হয়েছে)।

কোলার এবং হুট্টির চালু সোনাক্ষেত্র ছাড়াও আরো কয়েকটি সম্ভাবনাময় স্বর্ণক্ষেত্র রয়েছে, যেখান থেকে অদূর ভবিষ্যতে সোনা আহরণ করা সম্ভব হবে। এদের মধ্যে অনন্তপুর সোনাক্ষেত্র, গাদক সোনাক্ষেত্র এবং ওয়াইসাদ সোনাক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য।

কোয়ার্টজ রীফই সোনার প্রধানতম উৎস হলেও রীফ থেকে নদীজল বাহিত হয়ে নদীর বালিতে কিছু কিছু জায়গায় সোনার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। এ ধরনের সোনার ভাণ্ডার স্থানীয় লোকেরা কাঠনির্মিত চালুনির সাহায্যে বাছাই করে বালি থেকে সোনা আলাদা করে ফেলে। নদীর বালি থেকে সোনা আলাদা করে জীবিকা নির্বাহ করবার ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে আসাম, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীরের কিছু কিছু অঞ্চলে। নদীর বালি থেকে এভাবে সোনা উদ্ধার করবার কাজে বহু প্রাচীনকাল থেকে চালু থাকলেও বাণিজ্যিক গুরুত্ব নামমাত্র। কারণ এভাবে উদ্ধার করা সোনার পরিমাণ খুবই কম।

আসামের সুবনমিরি, লোহিত ডিহিং, বুড়ি ডিহিং এবং জংলু পানি নদীর বালি চালাচালি করে বেশ কিছু পরিমাণ সোনা পাওয়া গেছে। ইউরোপীয় পর্যটক ট্যাভারনীয়ের বিবরণ থেকে জানা যায়, প্রায় 12,000 থেকে 20,000 লোক এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং 1751 থেকে 1768 সালের ভেতরে এই অঞ্চলগুলি থেকে প্রতি বছর আনুমানিক 50 কিলোগ্রাম সোনা রাজা রাজেশ্বর সিংহকে খাজনা দেওয়া হত।

কাঠ নির্মিত চালুনির সাহায্যে সোনা বাছাই

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের (এবং পূর্বতন বৃহত্তর বঙ্গদেশের) ছোটনাগপুর অঞ্চলের সুবর্ণরেখা, কোয়েল, গাড়া, সাজাই নদীর বালিতে প্রচুর সোনার সন্ধান মিলেছে। সমস্ত ব্যাপারটা অনেকটা কিংবদন্তীর পর্যায়েই ছিল বহুদিন। কিন্তু 1889 সালে সোনাপেটের কাছে একটি নদীতে 78·6 গ্রাম ওজনের বিশুদ্ধ সোনার নাগেট পাওয়ার পর বহু লোক এই কাজে নেমে পড়ে রাতারাতি বড়লোক হবার আশায়।

পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা মাত্র এক ভাগ সোনা উৎপাদিত হয় ভারতবর্ষে। এখানে বছরে আনুমানিক 3000 কিলোগ্রাম সোনা উৎপাদিত হয়।

রাশিয়াকে বাদ দিলে সারা পৃথিবীতে যত সোনা উৎপাদিত হয়, তার মধ্যে শতকরা 77 ভাগই উত্তোলন করে দক্ষিণ আফ্রিকা। এর পরে রাশিয়া, কানাডা, এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। 1493 থেকে শুরু করে 1969 সাল পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে মোট সোনা উৎপাদনের পরিমাণ 219 কোটি 91 লক্ষ 84 হাজার 886 আউন্স। দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত র‍্যানড সোনাক্ষেত্র থেকে 1886 থেকে 1964 সালের মধ্যে 23,368 মেট্রিক টন সোনা পাওয়া গেছে।

ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা, নর্নাগ্রম হিলস্, শিলং-793003।

পেনসিল আবিষ্কারের কাহিনী

বরুণ মণ্ডল

গত দিনের প্রচণ্ড ঝড়ে বরোডেল অঞ্চলটি একেবারে বিপর্যস্ত। বড় বড় গাছ উপড়ে পড়েছে যেখানে সেখানে। অঞ্চলটি আবার পাহাড়ী অঞ্চল। ষষ্ঠ শতাব্দীর ইংলিশ লেক ডিস্ট্রিক্টের কাম্বারল্যাণ্ডে বরোডেল অবস্থিত। রাখাল বালকেরা ভেড়া চরিয়ে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করলো, এক উপড়ানো গাছের শিকড়ের নিচে কি যেন চক্‌চক্ করছে। কাছে গিয়ে ওরা দেখলো, শিকড় উঠে আসার জন্যে মাটিতে যে জায়গাটা গর্ত হয়েছে, সেখানে একটা অদ্ভুত জিনিস উঁকি দিচ্ছে—সেটা ঝকঝকে উজ্জ্বল কালো। একখণ্ড বের করে দেখলো জিনিসটা বেশ হালকা, নরম; ঘষলে কিছু কিছু জিনিসের ওপর দাগ পড়ে। হাত দিয়ে স্পর্শ করলে পিচ্ছিল মনে হয়। কোন্‌টা কার ভেড়া চেনার সুবিধার জন্যে রাখাল বালকেরা ঐ জিনিসটাকে চিহ্ন দেওয়ার কাজে ব্যবহার করতে লাগলো।

সব মানুষেরই কোন দিক দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করার বাসনা থাকে। সভ্যতার সূচনাতেও মানুষের মধ্যে এই বাসনা ছিল। পশুপাখি, গাছপাতা, দেবদেবীর ছবি সে খোদাই করত পাথরের গায়ে। খুঁজে পাওয়া এই পাথরের ঢেলার সাহায্যে মানুষ তার বাসনার প্রকাশ ঘটালো আরো নিপুণভাবে।

রাখাল বালকেরা সেদিন যা আবিষ্কার করেছিল, তা হলো গ্রাফাইট। আবিষ্কৃত হলো পৃথিবীর প্রথম গ্রাফাইট খনি। গ্রীক শব্দ 'গ্রাফাইট' মানে হলো 'লেখা'। 1789 সালে এই নামকরণ হয়। এর আগে চকচকে এই পাথরকে বলা হত 'ব্ল্যাক-লেড' বা কালো সীসা।

প্রকৃতিতে গ্রাফাইট পাওয়া যায় রূপান্তরিত শিলায়। অল্প পরিমাণে পালিক শিলা ও আগ্নেয় শিলাতেও এর সন্ধানে মেলে। কিন্তু প্রাকৃতিক গ্রাফাইট বিশুদ্ধ নয়। এতে বিভিন্ন ধরনের পদার্থ মিশে থাকে। হীরে এবং কয়লার মতো গ্রাফাইটেরও রাসায়নিক উপাদান কারবন। গ্রাফাইটে এই কারবনের পরিমাণ সর্বত্র এক নয়। কোথাও ওর পরিমাণ 30 শতাংশ আবার কোথাও 98 শতাংশ।

প্রথম দিকে পেটের নানারকম অসুখে গ্রাফাইট ব্যবহার করা হত, মাটির জিনিসপত্র চক্‌চকে করার জন্যে গ্রাফাইটের পালিশ দেওয়া হত। এমন কি লোহার জিনিসে মরচে পড়া রোধ করার জন্যেও গ্রাফাইট ব্যবহারের প্রচলন ছিল। গ্রাফাইট খনির ওপর প্রথম দিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কিন্তু ব্যবহার ক্রমশ বাড়তে সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দিল। 1752 সালে লণ্ডনে পার্লামেণ্ট একটা আইন পাশ করলো। যার ফলে ইচ্ছামত কেউ আর গ্রাফাইট তুলতে পারত না। অ্যাসিডের প্রভাবে কোন বিক্রিয়া হয় না বলে গ্রাফাইট ধাতু গলনের পাত্র প্রস্তুত করতে ব্যবহার করা হয়, তাপ এবং বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষমতার জন্যেও গ্রাফাইট বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুতিতে কাজে লাগে।

পেনসিলকে কেউ কেউ 'লেড পেনসিল' বলে। অথচ পেনসিলের শিষ লেড বা সীসা দিয়ে তৈরী হয় না, পেনসিলের শিষ তৈরী হয় গ্রাফাইট দিয়ে। গ্রাফাইটের পূর্বের নাম 'ব্ল্যাক-লেড' থেকেই সম্ভবত 'লেড-পেনসিল' কথাটির প্রচলন। গ্রাফাইট পাথর দিয়ে যেদিন রাখাল বালকেরা ভেড়ার গায়ে দাগ দিতে শুরু করেছিল, সেদিনই শুরু হয়েছিল পেনসিলের ব্যবহার। কিন্তু গ্রাফাইটের চাহিদা অধিক বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিল। কম গ্রাফাইট ব্যবহার করে কিভাবে পেন্সিল তৈরী করা যায়, তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হলো। নুরেমবার্গে জার্মান কোম্পানি স্টেটলার গ্রাফাইট গুঁড়োর সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে তৈরী করল নতুন ধরনের পেনসিলের শিষ। তারপর সেটা কাঠের আবরণে আঠার সাহায্যে আটকে দিল।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ শুরু হয়। ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ানের নির্দেশ পেয়ে নিকোলাস জ্যাক্‌স কঁতে ভাবতে শুরু করলেন কিভাবে আরো কম গ্রাফাইটে পেনসিল তৈরী করা যায়। বিজ্ঞানী কঁতে গ্রাফাইটের সঙ্গে কাদা মিশিয়ে তৈরী করলেন নতুন ধরনের শিষ। পরে ভিয়েনার হার্টমুথ গ্রাফাইটে কাদার পরিমাণ বাড়িয়ে কমিয়ে আবিষ্কার করলেন নরম ও শক্ত পেনসিলের শিষ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিন্তু এখানেই থেমে গেল না। আর তাই আজ আমরা হাতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের পেন্সিল।

---

73 শ্রীধর রায় রোড, কলিকাতা-39

রাতের আকাশে তারা

বিমান বসু

যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে আর চাঁদ না থাকে তা হলে রাতে আকাশ কেমন দেখতে হয়। তা নিশ্চয়ই তোমরা জানো। কালো কুচকুচে আকাশে চোখে পড়ে অসংখ্য হীরের মতো চকচকে তারার ঝাঁক। তোমাদের মধ্যে যারা গ্রামাঞ্চলে বা পাহাড়ী এলাকায় থাকো তারা নিশ্চয়ই এই দৃশ্য নিয়মিত দেখতে পাও। তবে শহরের আলো এবং ধোঁয়াধূলোর মধ্য দিয়ে বেশির ভাগ তারাই দেখতে পাওয়া যায় না। চোখে পড়ে কেবলমাত্র উজ্জ্বল তারাগুলো। তবুও শহরের আকাশে অন্ধকার রাত্রে কয়েক শো তারা শুধু চোখে দেখতে পাওয়া সম্ভব। গ্রামাঞ্চলের আকাশে দেখতে পাওয়া যায় কয়েক হাজার।

তোমরা হয়তো ভেবেছ এত তারা চিনতে পারা নিশ্চয়ই অসম্ভব ব্যাপার। সত্যি কথা বলতে কি, সব তারা চিনতে না পারলেও তাদের মধ্যে কয়েক শোকে একটু চেষ্টা করলেই তোমরা চিনে নিতে পার। তখন রাতের আকাশে তাদের দেখেই তোমরা তাদের নাম বলে দিতে পারবে।

আকাশে তারাদের চিনতে যাতে সুবিধে হয়, সেজন্যে বহু প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশের কৌতূহলী মানুষেরা এক অভিনব উপায় বার করেছিলেন। তাঁরা উজ্জ্বল তারাগুলি নিয়ে আকাশে বিভিন্ন ছবির কল্পনা করেছিলেন, যাতে করে সহজেই তাদের চিনতে পারা যায়। ঐ সব কাল্পনিক ছবির মধ্যে মানুষ ও জীবজন্তুর আকৃতি ত ছিলই, এমন কি সমুদ্রের জাহাজ, দাঁড়িপাল্লা এবং বাজনার যন্ত্র ইত্যাদি বহু চেনাজানা বস্তুর আকৃতিও তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। গোটা কয়েক উজ্জ্বল তারা নিয়ে তৈরী ঐ সব কাল্পনিক আকৃতিকেই আমরা 'রাশি' বা তারামণ্ডল বলে জানি।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে, আকাশে যত তারা দেখতে পাওয়া যায় তাদের মোট 88টা তারামণ্ডলে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে 12টা আছে রাশিচক্রে যার বিষয় পরে তোমাদের বলব। বিভিন্ন তারামণ্ডলে ভাগ করে দেওয়ার ফলে, বুঝতেই পারছ, আকাশে তারা চেনার কত সুবিধে হয়ে গেছে। কয়েক হাজার আলাদা আলাদা তারার চেয়ে 88টা তারামণ্ডল চিনে নেওয়া নিশ্চয়ই অনেক সোজা।

এখানে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি। তোমরা খবরের কাগজ বা মাসিক পত্রপত্রিকায় রাতের আকাশের মানচিত্র বা স্টারচার্ট নিশ্চয়ই দেখেছ। গোলাকার ঐ মানচিত্রে, যেমন নিচের ছবিতে দেখানো হয়েছে, বিভিন্ন তারামণ্ডলের অবস্থান দেখানো থাকে যা থেকে আকাশে তাদের চিনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঐ ধরনের মানচিত্র ব্যবহারের অনেক অসুবিধা আছে।

প্রথমত ঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্যে মানচিত্রটাকে মাথার ওপরে তুলে ধরে দেখতে হয়, যেটা খুবই অসুবিধা-জনক। তা ছাড়া, প্রায় আধাগোলাকার আকাশটাকে একটা সমতলে দেখানোর দরুন বিভিন্ন তারামণ্ডলের আকৃতি এবং তাদের পরস্পরের মধ্যেকার দূরত্বে অনেক বিকৃতি দেখা দেয়, যার ফলে অনেক সময় বিশেষ কোনও তারামণ্ডলকে খুঁজে বের করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

আর একটা সমস্যা হলো এই যে, ঐ সব মানচিত্র কেবলমাত্র কোনও একটি বিশেষ স্থানে এবং কোনও এক বিশেষ সময় ব্যবহারের জন্যেই তৈরী হয়। যেমন ধরো, নিচের ছবিতে রাতের আকাশের বিভিন্ন তারামণ্ডলের যে অবস্থান দেখানো হয়েছে সেটা দেখা যাবে কেবলমাত্র দিল্লী থেকে 1 জুন রাত 9টায়, অথবা 16 জুন রাত 8টায় কিংবা 1 জুলাই সন্ধ্যে 7টায়। যদি তোমাদের কেউ আরও উত্তরে ধরো কাশ্মীরে যাও, তা হলে দেখবে যে ঐ মানচিত্রে দক্ষিণ দিগন্তের কাছে যেসব তারা দেখানো হয়েছে সেগুলিকে আর দেখা যাবে না। আবার সুদূর দক্ষিণে, কেরল বা মাদ্রাজে গেলেও ঐ একই ব্যাপার। এবারে উত্তর দিগন্তের কাছের তারাগুলিকে দেখতে পাওয়া যাবে না। সুতরাং বুঝতেই পারছ, মানচিত্র দেখে তারা চিনতে হলে প্রতিটি জায়গার জন্যে চাই আলাদা আলাদা মানচিত্র।

অবশ্য এই অসুবিধা দূর করার খুব সোজা উপায় আছে। সেটা হলো প্রথমে কয়েকটা বিশেষ তারামণ্ডল ভালভাবে চিনে নেওয়া এবং পরে সেগুলিকে কেন্দ্র করে বাকি তারামণ্ডলগুলিকে খুঁজে বের করা।

ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি। ধরো তোমাদের কেউ কলকাতা শহরে নতুন এসেছ। হাওড়া স্টেশন থেকে রাসেল স্ট্রিটে যাবে, কিন্তু রাস্তা চেন না। কি করবে? যদি কলকাতা শহরের একটা মানচিত্র যোগাড় করতে পারো তা হলে তা থেকে নিশ্চয়ই তোমার গন্তব্যস্থল খুঁজে

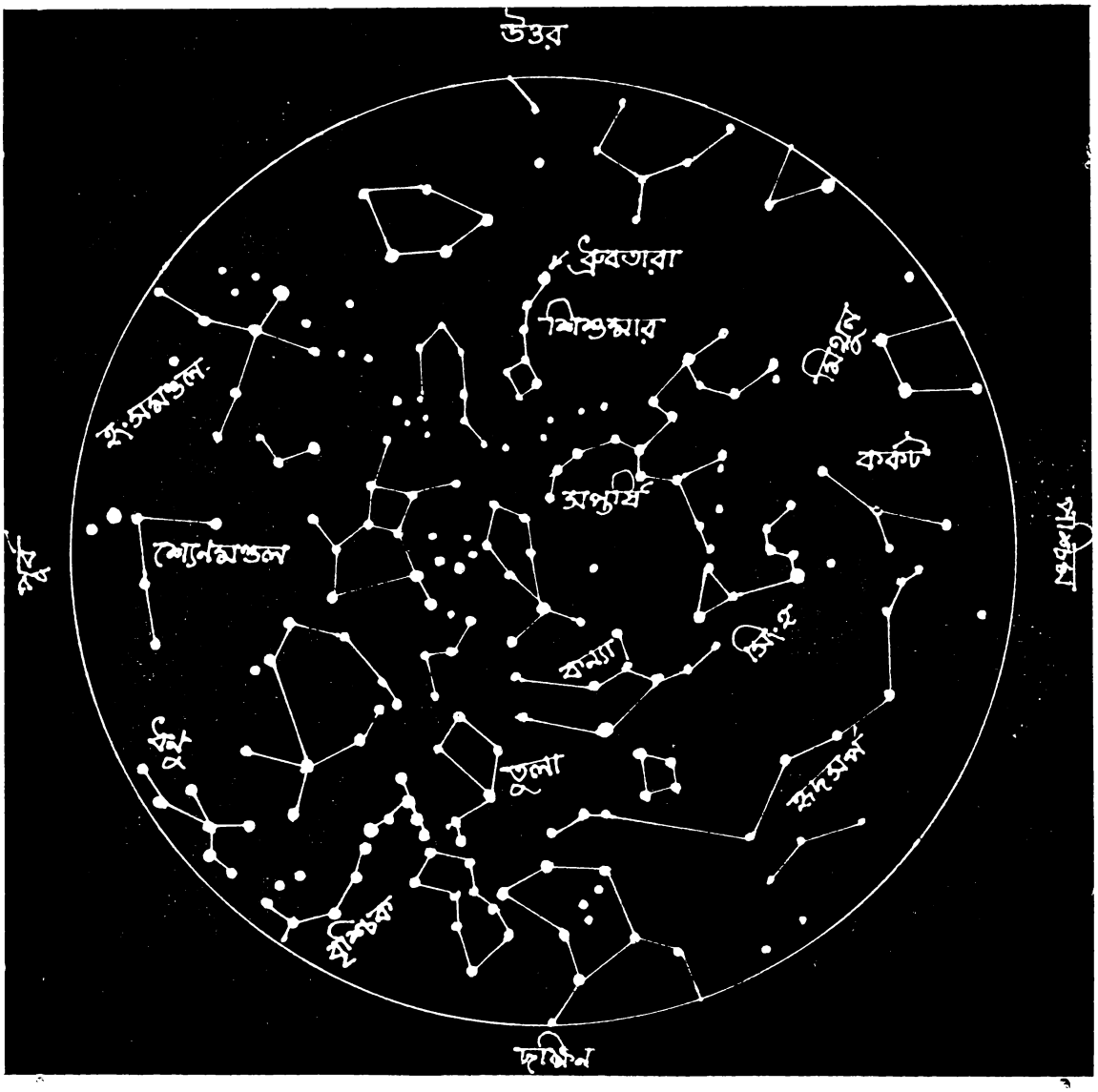

জুনের রাতের আকাশ (দিল্লী)

নিতে পারবে। কিন্তু যদি মানচিত্র না থাকে ? তা হলেও উপায় আছে। যদি তোমাকে কেউ রাস্তা বলে দেয়। যেমন ধরো, যদি তোমাকে বলি, হাওড়া ব্রীজ থেকে ব্রেবোর্ণ রোড ফ্লাইওভার দিয়ে নেমে বি. বা. দি. বাগকে ডাইনে রেখে সোজা রাজভবনের পাশ দিয়ে বাঁদিকে শহীদ মিনারকে রেখে মেয়ো রোড বরাবর গিয়ে পার্ক স্ট্রীটে ঢুকে ডানদিকের প্রথম রাস্তাটাই হলো রাসেল স্ট্রীট, তা হলে নিশ্চয়ই তোমার সেখানে পৌঁছতে কোনও অসুবিধা হবে না। কারণ বি. বা. দি. বাগ, রাজভবন, শহীদ মিনার এগুলো সবকটিই হলো কলকাতার বিশিষ্ট জায়গা, এদের চিনে নিতে মোটেই কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

আকাশে তারা চেনাটাও ঠিক একইভাবে করা যায়। যদি বিশেষ কয়েকটি তারামণ্ডলকে একবার ভাল করে চিনে নিতে পারো, পরে তাদেরকেই কেন্দ্র করে ডানে বাঁয়ে বা ওপরে নিচে দেখলেই বাকি তারামণ্ডলগুলিকে চিনে নিতে পারবে।

তারা চেনার সহজ উপায় জানবার আগে তারাদের বিষয় কিছু জেনে নেওয়া নিশ্চয়ই অবান্তর হবে না। প্রথমেই দেখা যাক্ তারা বা নক্ষত্র আসলে কি।

আকাশে চকচকে বিন্দুর মতো দেখালেও আসলে কিন্তু প্রত্যেকটি তারাই হলো বিশাল আকারের জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড। এদের মধ্যে অনেকেরই আয়তন আমাদের সূর্যের চেয়ে কয়েক শো বা হাজার গুণ বেশি। কিন্তু বড় হলে কি হবে, এরা আমাদের পৃথিবী থেকে কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে আছে, আর সেজন্যেই ওরা এত ছোট দেখায়। আমাদের সূর্য হলো মাঝারি আকারের একটা তারা, কিন্তু পৃথিবীর খুব কাছে থাকার দরুন অত বড় দেখায়।

পৃথিবী থেকে তারাদের দূরত্বের একটা আন্দাজ তোমাদের দিই। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হলো প্রায় 15 কোটি কিলোমিটার। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে লাগে প্রায় 9 মিনিট। সে তুলনায় আমাদের সবচেয়ে কাছের যে তারা, নাম 'প্রক্সিমা সেণ্টাউরি' তার দূরত্ব হলো প্রায় 10 লক্ষ কোটি (10 এর পরে 12টা শূন্য) কিলোমিটার। মানে সূর্যের দূরত্বের প্রায় 60,000 গুণ। প্রক্সিমা সেণ্টাউরি থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে লাগে 4.2 বছর। সেজন্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় ঐ দূরত্বের 4.2 আলোকবর্ষও বলা হয়। এটা তো হলো পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের তারার দূরত্ব। বেশির ভাগ তারার দূরত্ব এর চেয়েও অনেক, অনেক বেশি। সে সব তারা থেকে আলো আসতে হাজার হাজার বছর সময় লাগে।

অনেক দূরে থাকার দরুন তারাদের নিজস্ব গতি থাকা সত্ত্বেও পৃথিবী থেকে তাকিয়ে তাদের আকাশে স্থির মনে হয়। ব্যাপারটা একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে। ট্রেনে চড়ে যাওয়ার সময় তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, রেল লাইনের কাছের গাছপালা খুব বেগে চলে যাচ্ছে বলে মনে হয়। দূরের গাছপালা অত বেগে চলে না, মনে হয় অনেক আস্তে চলছে। আরও দূরে আকাশের মেঘ দেখে মনে হয় প্রায় স্থির হয়ে আছে। আকাশে সূর্য বা চাঁদের বেলাতেও তাই। মানে দূরত্ব যত বেশি, প্রতীয়মান গতিবেগও তত কম মনে হয়। তারাদের বেলায়, হাজার হাজার বছর পরেও তাদের গতি চোখে পড়ে না। মনে হয় তারা যেন সত্যিই আকাশে স্থির হয়ে আছে। আর স্থির বলেই তাদের নিয়ে তারামণ্ডলগুলির কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে।

রাতের আকাশে তারাদের মধ্যে একটা জিনিস নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ্য করেছ। তাদের মধ্যে কোনোটা খুব উজ্জ্বল, আবার কোনও কোনোটা এত ক্ষীণ যে প্রায় দেখাই যায় না। এটা হয় দুটো কারণে। আগেই বলেছি সব তারা এক সাইজের হয় না। তাদের মধ্যে কোনোটা ছোট, কোনোটা অতিকায় আকারের। ছোট তারার চেয়ে বড় তারা বেশি জ্বলজ্বলে হবে সেটা স্বাভাবিক। অবশ্য তারার উজ্জ্বলতা তার তাপমানের ওপরও নির্ভর করে। যত বেশি তাপমান তত বেশি সে তারার ঔজ্জ্বল্য।

কিন্তু আসলে কোনোও তারার ঔজ্জ্বল্য যাই হোক না কেন, পৃথিবী থেকে আমরা তাকে কিরকম দেখবো সেটা নির্ভর করবে দূরত্বের ওপর। সুতরাং আসলে খুব উজ্জ্বল হলেও কোনো তারার দূরত্ব যদি বেশি হয় তবে তাকে ক্ষীণ দেখাবে। আবার আসল ঔজ্জ্বল্য কম হলেও, যদি তারার দূরত্ব কম হয় তবে তাকে অনেক উজ্জ্বল দেখাবে।

পৃথিবী থেকে কোনো তারা কতখানি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তার একটা মাপকাঠিও আছে। তাকে বলা হয় তারার প্রভার মান। প্রাচীনকালে জ্যোতিষীরা তারাদের ঔজ্জ্বল্য অনুসারে ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। সেসময় দুরবীন ইত্যাদি ছিল না। সুতরাং শুধু চোখে দেখেই তারার ঔজ্জ্বল্য বিচার করতে হত। এইভাবে সূর্য অস্ত যাবার পরে প্রথমে যে-সব তারা আকাশে ফুটে ওঠে তাদের বলা হত প্রথম প্রভার তারা। পরেরগুলো দ্বিতীয় প্রভার, তার পরেরগুলো তৃতীয় প্রভার। এইভাবে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রভার তারাও চিহ্নিত করা হত। এখানে একটা কথা মনে রেখ, খালি চোখে কেবলমাত্র ষষ্ঠ প্রভা পর্যন্তই তারা দেখতে পাওয়া সম্ভব।

পরবর্তীকালে দূরবীনের আবিষ্কারের পর দেখা গেল, তারার প্রভা বা ঔজ্জ্বল্যের এই ক্রমিক শ্রেণীবিভাগে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। যেমন ধরো, প্রথম প্রভার তারার ঔজ্জ্বল্য ষষ্ঠ প্রভার তারার ঔজ্জ্বল্যের চেয়ে 100 গুণ বেশি। এর মানে হলো এই যে, কোনো একটি প্রভার তারার ঔজ্জ্বল্য তার পরবর্তী প্রভার তারার ঔজ্জ্বল্যের চেয়ে 2.51 গুণ বেশি। যেমন ধরো, প্রথম প্রভার তারা দ্বিতীয় প্রভার তারার চেয়ে 2.51 গুণ বেশি উজ্জ্বল, দ্বিতীয় প্রভার তারা তৃতীয় প্রভার তারার চেয়ে 2.51 গুণ বেশি উজ্জ্বল ইত্যাদি। পরে যন্ত্রপাতি দিয়ে মাপজোক করে দেখা গেল

এমনও তারা আছে যার ঔজ্জ্বল্য প্রথম প্রভার তারার ঔজ্জ্বল্যের চেয়েও বেশী। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিলেন শূন্য প্রভার তারা। এই হিসেবে আকাশের অন্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগুলির ঔজ্জ্বল্যের মানও ঠিক একইভাবে দেওয়া হলো। এখানে শূন্য প্রভার তারার চেয়েও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে দেওয়া হলো নেগেটিভ বা বিয়োগ প্রভার মান। যেমন ধরো আকাশের উজ্জ্বল তারা লুব্ধকের মান হলো—1.43, শুক্র গ্রহের (যখন সবচেয়ে উজ্জ্বল)—4,4, পূর্ণিমার চাঁদের—1.26, সূর্যের—2.68। এখানে একটা কথা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। তারার প্রভার মান বা সংখ্যা যত বেশি, তার উজ্জ্বলতা তত কম। সংখ্যা যত কম, উজ্জ্বলতা তত বেশি।

রাতের আকাশের আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তার নক্‌শাটা ক্রমাগতই বদলে যাচ্ছে। যেমন ধরো ওপরের ছবিতে আকাশের যে নক্‌শা দেখানো হয়েছে সেটা দেখা যাবে রাত 9 টায় কেবলমাত্র 1 জুন তারিখে। পরের দিন, অর্থাৎ 2 জুন রাত 9 টায় কিন্তু ঐ নক্‌শা বদলে যাবে। কারণ প্রতিদিন আকাশের তারামণ্ডলগুলো পশ্চিম দিকে প্রায় এক ডিগ্রী সরে যায়। এটা হয় সূর্যের কক্ষপথে পৃথিবীর বার্ষিক গতির দরুন। আর এরই ফলে বছরের বিভিন্ন মাসে আকাশে বিভিন্ন তারামণ্ডলকে দেখতে পাওয়া যায়।

একটা কথা অবশ্য এখানে মনে রাখতে হবে। পৃথিবী থেকে আমরা তারা কেবল রাতের আকাশেই দেখতে পাই। কারণ দিনের বেলায় সূর্যের প্রখর তেজে বায়ু-মণ্ডলের ভেতর দিয়ে আকাশে তারা চোখে পড়ে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, দিনের বেলা আকাশে তারা থাকে না। পৃথিবীর চারপাশে যদি বায়ুমণ্ডল না থাকত তবে দিনের বেলাতেও আমরা তারা দেখতে পেতাম, যেমনটি দেখা যায় চাঁদের আকাশে।

পৃথিবীর বার্ষিক গতির দরুন আর একটা ব্যাপার হয়। সেটা হলো একে একে পশ্চিম আকাশে তারামণ্ডলগুলির অন্তর্ধান এবং পূব আকাশে নতুন তারামণ্ডলের আবির্ভাব। যেমন ধরো, 1 জুন রাত 9 টায় পশ্চিম দিগন্তে দেখা যায় মিথুন রাশিকে। সে সময় পূব আকাশে দিগন্তের ওপর থাকে ধনুরাশি। এক মাস পরে 1 জুলাই রাত 9 টায় পশ্চিম আকাশে মিথুনরাশিকে আর দেখা যায় না। ওদিকে পূব দিগন্তে তখন দেখা দেয় কুম্ভরাশি। এই-ভাবে চলতে চলতে এক বছর পর আবার আকাশের নক্‌শা ঠিক আগের অবস্থায় ফিরে আসে।

7 ইউ এফ কলেজ রোড, নয়াদিল্লী-1

সহজ কথায় রসায়ন : [ছয়]

সুপরিচিত খনিজ অ্যাসিড

অমরনাথ রায়

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডের নাম সব ছাত্রছাত্রীরই জানা আছে। বিভিন্ন খনিজ পদার্থ থেকে এই অ্যাসিডগুলিকে প্রস্তুত করা হয় বলে এদের খনিজ অ্যাসিড বলে। সোডিয়াম ক্লোরাইড নামক খনিজ পদার্থ থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফার নামক খনিজ পদার্থ থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড এবং পটাসিয়াম নাইট্রেট নামক খনিজ পদার্থ থেকে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা হয়। কিভাবে প্রস্তুত করা হয় তা তোমাদের পাঠ্যবইতে ভালভাবেই লেখা আছে। এ ছাড়া ঐ অ্যাসিডগুলির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মও বইতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে। সেগুলি তোমরা পড়েছ। কিন্তু কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছ তা যাচাই করা দরকার।

জ্ঞান যাচাই করার দুটি সহজ উপায় আছে। একটি হচ্ছে, এমন সব প্রশ্ন করা, যার উত্তরে সহজ কথায় তিন-চার লাইন লিখতে হয়। আর দ্বিতীয় উপায়টি হলো নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করা, যার উত্তরে একটি বা দু'টি কথা, অক্ষর বা চিহ্নের চেয়ে বেশি লেখবার দরকার হয় না। যেমন ধর, তোমাকে যদি প্রশ্ন করি : গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডে জল ঢালতে নেই কেন? এর উত্তরে তোমাকে লিখতে হবে : গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডে জল ঢাললে এত উত্তাপ সৃষ্টি হয় যে মিশ্রণ প্রায় ফুটতে থাকে এবং জল স্টীমে পরিণত হয়ে চারদিকে ছিট্‌কে গিয়ে বিপত্তি ঘটাতে পারে। তাই গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডে জল ঢালতে নেই।

এ হলো প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রশ্ন ও তার আদর্শ উত্তর। এবারে আসা যাক্ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তরের কথায়। বল দেখি কোন্‌টা ঠিক?

'নাইটার' বলতে আমরা বুঝি :

(ক) সোডিয়াম নাইট্রেটকে।

(খ) পটাসিয়াম নাইট্রেটকে।

(গ) অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটকে।

এর উত্তর হবে 'খ' অর্থাৎ কিনা পটাসিয়াম নাইট্রেট। এ হলো নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর। তবে হ্যাঁ, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নেরও রকমফের আছে। নিচে তোমাদের পরিচিত তিনটি খনিজ অ্যাসিডের উপর কয়েক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন লিখে দিলাম। বই না দেখে প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর লেখার চেষ্টা কর।

প্রবন্ধের শেষে প্রশ্নগুলির উত্তরও দেওয়া আছে। তোমার উত্তরের সঙ্গে সেই উত্তর মিলিয়ে দেখে নিতে পার, ঠিক্ ঠিক্ উত্তর লিখতে পেরেছ কিনা। কোনও প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে তাও জেনে নিতে পারবে প্রবন্ধের শেষের উত্তর দেখে।

1. জলের প্রতি আসক্তি কোন্ অ্যাসিডের বেশি?

(ক) গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড, (খ) গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, (গ) গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড।

2. লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে বেরিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ মেশালে যে অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হয়, তার রং কেমন?

(ক) সাদা (খ) নীল (গ) হলুদ।

3. সত্য উক্তিটির পাশে √ চিহ্ন বসাও :

বিশুদ্ধ নাইট্রিক অ্যাসিড

(ক) হলুদ বর্ণের (খ) বর্ণহীন (গ) নীল বর্ণের।

4. বলয় পরীক্ষা দ্বারা কোন্ অ্যাসিডকে সনাক্ত করা হয়?

(ক) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (খ) সালফিউরিক অ্যাসিড (গ) নাইট্রিক অ্যাসিড।

5. প্রশ্নের সঠিক উত্তর বোঝাবার জন্যে প্রশ্নের পাশে 'হাঁ' বা 'না' লেখ।

জ্বলন্ত কার্বনের সঙ্গে গাঢ় ও উত্তপ্ত নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।

6. নিচের শূন্য স্থানগুলি সঠিক সংখ্যা বসিয়ে পূরণ কর :

—আয়তন গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড এবং—আয়তন গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণকে অম্লরাজ বলে।

7. নাইট্রিক অ্যাসিডের বলয় পরীক্ষা করতে হলে নিচের কোন্‌টির প্রয়োজন হয় না?

(ক) তামার কুচি, (খ) সদ্যপ্রস্তুত ফেরাস সালফেট দ্রবণ, (গ) গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড।

8. চিনির গাঢ় জলীয় দ্রবণে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করলে কোন্‌টি ঘটে?

(ক) দ্রবণটি কালো হয়ে যায়।

(খ) দ্রবণের বর্ণের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

(গ) দ্রবণটি শীতল হয়ে যায়।

9. রসায়ন-বিজ্ঞানে অধঃক্ষেপ বোঝাতে নিচের কোন্ চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়?

(ক) $\rightleftharpoons$ (খ) $\uparrow$ (গ) $\downarrow$

10. সঠিক উত্তরটির মাথায় √ চিহ্ন বসাও ঃ

কপারের সঙ্গে লঘু খনিজ অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

হাঁ	না

11. কোনটি ঠিক ?

ওলিয়াম হলো

(ক) ধূমায়মান সালফিউরিক অ্যাসিড

(খ) গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড

(গ) গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড

12. নিচে কয়েকটি যৌগের নাম এবং পাশে আণবিক সংকেত দেওয়া আছে। কোন্ যৌগটির সঙ্গে কোন্ আণবিক সংকেতটি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা লেখ।

যৌগের নাম		যৌগের আণবিক সংকেত	
(ক)	নাইট্রিক অ্যাসিড	(চ)	H_2SO_4
(খ)	সালফিউরিক অ্যাসিড	(ছ)	HCl
(গ)	হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড	(জ)	HNO_3
(ঘ)	সোডিয়াম বাই-সালফেট	(ঝ)	Na_2SO_4
(ঙ)	সোডিয়াম সালফেট	(ঞ)	$NaHSO_4$

13. সত্য উক্তির পাশে √ চিহ্ন বসাও ঃ

নিচের কোন্ অ্যাসিড সোডিয়াম কার্বনেটের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত করতে পারে ?

(ক) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড,

(খ) সালফিউরিক অ্যাসিড,

(গ) নাইট্রিক অ্যাসিড।

14. নিচের কোন্ সমীকরণটি ভুল ?

(ক) $3Cu + 8HNO_3 = 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$

(খ) $Cu + 4HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2N_2O + 2H_2O$

(গ) $4Cu + 10HNO_3 = 4Cu(NO_3)_2 + N_2O + 5H_2O$

15. নিচের কোন্ অধঃক্ষেপটি নাইট্রিক অ্যাসিডে অদ্রাব্য অথচ অতিরিক্ত অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইডে দ্রাব্য ?

(ক) বেরিয়াম সালফেট।

(খ) সিলভার ক্লোরাইড।

উত্তর ঃ

(1) গ, (2) ক, (3) খ, (4) গ, (5) হাঁ, (6) 1 ; 3 (7) ক, (8) ক, (9) গ, (10) না, (11) ক, (12) ক→জ ; খ→চ ; গ→ছ ; ঘ→ঞ ; ঙ→ঝ (13) ক, খ এবং গ তিনটি অ্যাসিডই, (14) খ, (15) খ।

ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর

আগুন নেভাবার যন্ত্র

বিবেক রায়

কথায় বলে 'আগুন নিয়ে খেলা'! একটু অসাবধান হলে আর রক্ষে নেই। কাছে পিঠে দাহ্য পদার্শ যা থাকে, জ্বলে পুড়ে সব ছাই হয়ে যায়। খড়ের ঘরে আগুন লেগে কিংবা বৈদ্যুতিক সার্কিটে গোলযোগের দরুন পূজা প্যাণ্ডেলে ও অট্টালিকায় আগুন লেগে প্রতি বছর কতো প্রাণ ও সম্পত্তিহানি হয় তার ইয়ত্তা নেই। ভয়াবহ এই আগুনের হাত থেকে বাঁচতে ও সম্পত্তি বাঁচাতে হ'লে দরকার আগুন নেভাবার যন্ত্র। এ যন্ত্র অনেক রকমের হয়। এদের কথা বলতে যাবার আগে আগুন কেন জ্বলে তা জেনে রাখা দরকার।

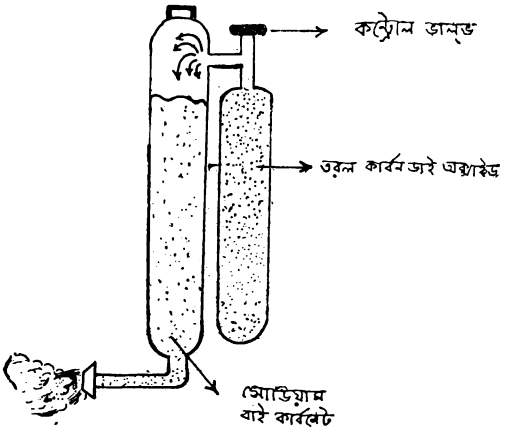

এক নম্বর চিত্র

কাঠ, কাগজ বা তেলের মতো কোন দাহ্য পদার্থকে উত্তপ্ত করলে পদার্থটির বিযোজন শুরু হয়। বিযোজনের ফলে অতি দাহ্য গ্যাস উৎপন্ন হয়। সেই গ্যাস বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে জ্বলে ওঠে। জ্বলনের ফলে উৎপন্ন তাপে দাহ্য পদার্থটির আরও বিযোজন ঘটে। প্রক্রিয়াটি ততক্ষণই চলে, যতক্ষণ পর্যন্ত দাহ্য পদার্থটি অথবা সেটিকে দহনের জন্যে প্রাপ্তব্য অক্সিজেন নিঃশেষ না হয়। কাজেই আগুন নেভাবার যন্ত্রের কাজ হলো প্রধানত দু রকম। প্রথমত জ্বলন্ত পদার্থটিকে শীতল করা, দ্বিতীয়ত জ্বলন্ত পদার্থের উপর একটি অদাহ্য আবরণ সৃষ্টি করা। এ রকম আবরণ সৃষ্টি করতে পারলে জ্বলন্ত বস্তুর উপর জ্বলনের জন্যে প্রয়োজনীয় বায়ু বা অক্সিজেন সরবরাহ ছিন্ন হয়।

আগুনের উৎসের উপর নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ ধরনের আগুন নেভাবার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। আগেকার দিনে বড় বড় চামড়ার থলি জলে ভর্তি করে আগুন নেভাবার উদ্দেশ্যে রেখে দেওয়া হত। আজকাল বিজ্ঞানের দৌলতে আমরা উন্নত ধরনের আগুন নেভাবার যন্ত্র হাতে পেয়েছি। একে একে সেগুলির কথা আমরা আলোচনা করব।

এক নম্বর চিত্রে যে যন্ত্রটি দেখানো হয়েছে তার মোচাকৃতি পাত্রটির মধ্যে ছয় থেকে দশ লিটার জলে সোডিয়াম বাই-কার্বনেট দ্রবীভূত থাকে। পাত্রটির ভেতরে একটি কাচের বদ্ধ নলে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড রাখা থাকে। প্রয়োজনের সময় যন্ত্র-সংলগ্ন একটি ধাতব দণ্ডে উল্লম্বভাবে আঘাত হানলে দণ্ডটির সূঁচালো আগা ভিতরে ঢুকে গিয়ে অ্যাসিডপূর্ণ কাচনলটিকে ভেঙ্গে ফেলে। তখন ঐ অ্যাসিডের সঙ্গে সোডিয়াম বাই-কার্বনেটের জলীয় দ্রবণের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। পাত্রের মধ্যে সৃষ্ট ঐ গ্যাস-এর চাপে যন্ত্রের মুখের ছিদ্র দিয়ে জল উচ্চ চাপে ঠেলে বেরিয়ে আসে। জ্বলন্ত বস্তুর উচ্চ উষ্ণতায় জলের বাষ্পীভবনে শৈত্যের সৃষ্টি হয়। কারণ বাষ্পীভবনের জন্যে জল জ্বলন্ত বস্তু থেকেই প্রয়োজনীয় তাপ সংগ্রহ করে। এ ছাড়া সৃষ্ট জলীয় বাষ্প জ্বলনের স্থান থেকে বায়ু বা অক্সিজেনকেও সরিয়ে দেয়। এই উভয় ক্রিয়ার ফলে আগুন যায় নিভে। কখনও কখনও এই ধরনের আগুন নেভাবার যন্ত্রের নলের মুখে বিশেষ ধরনের যান্ত্রিক ব্যবস্থা রাখা হয়। তার ফলে জল কুয়াশার আকারে যন্ত্রের মুখ থেকে নির্গত হয়। জ্বলন্ত বাষ্প অথবা গ্যাসের আগুন নেভাবার পক্ষে এই ধরনের যন্ত্র বিশেষ উপযোগী। কিন্তু বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে

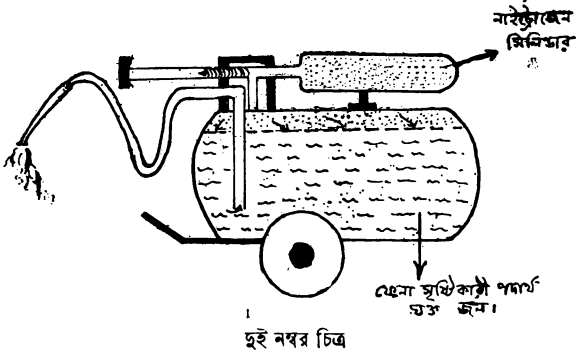

দুই নম্বর চিত্র

কিংবা দাহ্য দ্রাবকে আগুন লাগলে তা নেভাবার পক্ষে জল ছেটানো আগুন নেভাবার যন্ত্র মোটেই উপযোগী নয়।

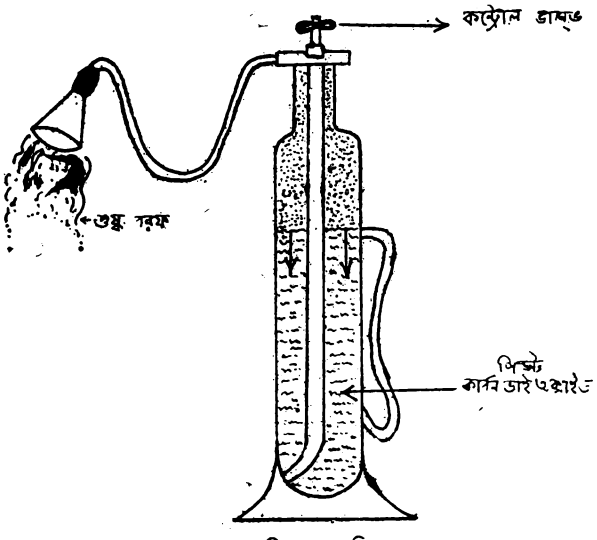

তিন নম্বর চিত্র

তেল, গ্যাসোলিন ইত্যাদিতে আগুন লাগলে তা নেভাবার জন্যে ফেনা সৃষ্টিকারী আগুন নেভাবার যন্ত্র (2 নম্বর চিত্র) ব্যবহার করা হয়। এতে জলের সঙ্গে 2% থেকে 6% পর্যন্ত ফেনা সৃষ্টিকারী তরল পদার্থ রেখে তাতে নাইট্রোজেন মেশাবার ব্যবস্থা থাকে। ফেনা সৃষ্টিকারী পদার্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয় বিযোজিত প্রোটিন অথবা অন্য কোন কৃত্রিম পদার্থ, যা ফেনা সৃষ্টি করতে সক্ষম। সৃষ্ট ফেনা দাহ্য পদার্থকে শীতল করে এবং তাকে বায়ুর সম্পর্কশূন্য করে আগুন নেভাতে সক্ষম

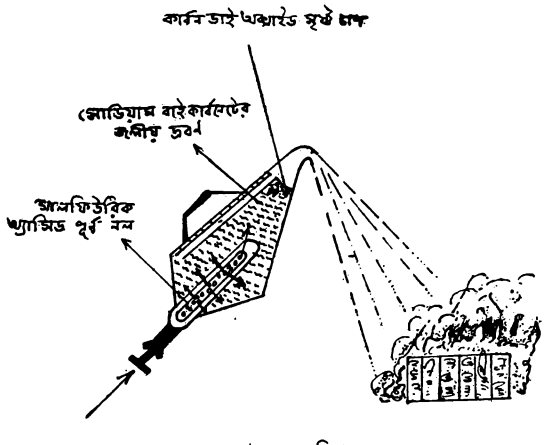

চার নম্বর চিত্র

হয়। অবশ্য এই ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির আগুন নেভানো সম্ভব হয় না।

যে সব ক্ষেত্রে জল ব্যবহার করা যায় না, সেইসব ক্ষেত্রে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদনকারী আগুন নেভাবার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির আগুন নেভাবার পক্ষে এ যন্ত্র খুবই কার্যকর। তিন নম্বর চিত্রে এর যান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে। স্বাভাবিক উষ্ণতায় এ যন্ত্রের সিলিণ্ডারের মধ্যে পাঁচ থেকে ছয় লিটার তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইড উচ্চ চাপে পিষ্ট করে রাখা হয়। সিলিণ্ডারের সঙ্গে যুক্ত নলের ভাল্‌ভটি খুলে দিলেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড হঠাৎ প্রসারিত হবার সুযোগ পেয়ে খুব শীতল হয়ে 'শুষ্ক বরফ' সৃষ্টি করে। 'শুষ্ক বরফ' হলো কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড। এর উষ্ণতা ($-79°C$)। শুষ্ক বরফকে যখন আগুনের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়, তখন জ্বলন্ত বস্তুর উষ্ণতা জ্বলনাংকের অনেক নিচে নেমে যায়। একই সঙ্গে ঐ 'শুষ্ক বরফ' জ্বলন্ত বস্তুর উপর থেকে বায়ুকে সরিয়ে দিয়ে আগুন নিভিয়ে দেয়।

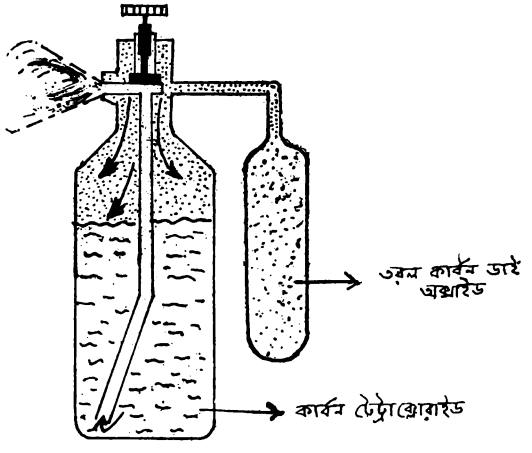

(পাঁচ নম্বর চিত্র)

দাহ্য তরল অথবা বিদ্যুৎ থেকে সৃষ্ট আগুন নেভাবার জন্যে শুষ্ক আগুন নেভাবার যন্ত্র (চার নম্বর চিত্র) ব্যবহৃত হয়। এ যন্ত্রে সোডিয়াম বাই-কার্বনেট নামক রাসায়নিক দ্রব্যটি ভরা থাকে। তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে গ্যাসীভূত হতে দিয়ে, সেই গ্যাসের চাপ প্রয়োগে সোডিয়াম বাই কার্বনেটকে যন্ত্রের মুখ দিয়ে ঠেলে বের করে দেওয়া হয়। আগুনের শিখার উপর

শুষ্ক সোডিয়াম বাই-কার্বনেট এসে পড়লেই আগুনের তাপে তা সোডা বাষ্পে ও কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। জ্বলন্ত বস্তুর উপর সোডা একটি আস্তরণ সৃষ্টি করে সেখানে বায়ুর প্রবেশ বন্ধ করে দেয়। আর সৃষ্ট কার্বন ডাই-অক্সাইডও আগুনের সংস্পর্শে বায়ুর আসার পথকে রুদ্ধ করে। ফলে আগুন যায় নিভে।

কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড একটি উৎকৃষ্ট অগ্নিনির্বাপক রাসায়নিক দ্রব্য। সিলিণ্ডারের মধ্যে রাখা কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইডকে সিলিণ্ডারের নির্গম নল দিয়ে বের করে দেয় তরল কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে সৃষ্ট উচ্চ বাষ্প চাপ। পাঁচ নম্বর চিত্রে এই যন্ত্রের গঠনপ্রণালী দেখানো হয়েছে। 76·5C উষ্ণতায় কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড বাষ্পীভূত হয় এবং সেই অদাহ্য গ্যাস আগুনের উপর ছড়িয়ে পড়ে আগুনকে বায়ুর সম্পর্কশূন্য করে নিভিয়ে দেয়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে আগুন লাগলে তা নেভাবার পক্ষে এই ধরনের যন্ত্র বিশেষ উপযোগী।

এন বি / টি 55 খড়্গপুর, মেদিনীপুর

বিচিত্র উদ্ভিদ

প্রদীপকুমার ধর

গাছপালার কথা বলতেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে একটা পরিচিত ছবি, যার নিচের দিকে থাকে মূল বা শিকড় তারপর মাটির উপরে কাণ্ড, ফুল ফল পাতা ইত্যাদি। কিন্তু এখানে এমন কতকগুলো গাছের কথা বলব যাদের মধ্যে কারো কারো মূল বা শিকড় নেই, আবার কারো কারো গোটা গাছটাই একটা মূল। গাছগাছালির জগতে এমন কিছু কিছু বৈচিত্র্য-ভরা উদ্ভিদের সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন যা শুনলে আশ্চর্য হতেই হয়।

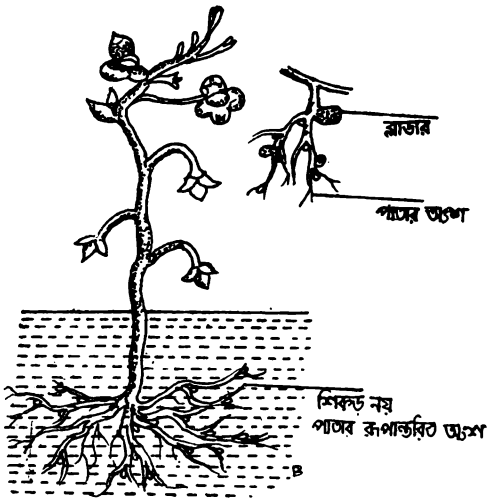

মূলহীন উদ্ভিদ পাতাঝাঁঝি

জল থেকেই শুরু করা যাক। যেমন পাতাঝাঁঝি জলেই এদের আবাস। তাই আমরা একে জলজ উদ্ভিদ্ বলে থাকি। সাধারণত গরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এদের সাক্ষাৎ মেলে। আজ পর্যন্ত 200 প্রজাতির পাতাঝাঁঝি বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা দিয়েছে। মোটামুটি 20টা প্রজাতি পুকুর, বিল কিংবা বদ্ধ জলাশয়ের বাসিন্দা। এই গাছগুলোর মূল বলে কোন অংশ নেই। পাতাঝাঁঝির ছবিটা দেখে ভাবছ বুঝি জলের মধ্যে যে সরু সরু অংশগুলো আছে সেগুলোই তার মূল। তা কিন্তু সত্যি নয়। পাতাঝাঁঝির পাতাগুলো জলের নিচে রূপান্তরিত হয়ে সুরু সুরু অঙ্গ সৃষ্টি করে। ঠিক ঝাঁঝরির মতো। পাতার ঝাঁঝরি, তাই হয়তো গাছটার নাম হয়েছে পাতাঝাঁঝি। পাতার কিছু-কিছু অংশ আবার পরিবর্তনের ফলে গোল গোল মোটরের দানার মতো বেশ কতগুলো অঙ্গের সৃষ্টি করে। একে 'ব্লাডার' বলা হয়। এই অংশগুলো সাধারণত সবুজ রংয়ের হয়। এই অংশগুলো শিকড়ের কাজ সম্পাদন করে একটু আলাদাভাবে, কিন্তু খুব নিষ্ঠাভরে।

এবার আর একটা গাছের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। সেটা হলো উলফিয়া। জেনে রাখো এটা হলো সবচেয়ে ছোট সপুষ্পক উদ্ভিদ। এই গাছের আকার আয়তন কিছুটা চ্যাপ্টা ধরনের, অনেকটা পাতার মতো। কেউ কেউ একে পর্ণকাণ্ড বলে থাকেন। এই গাছেরও কোন শিকড় নেই। একই পর্যায়ের আর একটা গাছ হলো এপিপোজিয়াম।

এ তো গেল যাদের মূল নেই তাদের কথা। এবার যাদের গোটা দেহটাই একটা মূল, তাদের কথা বলছি।

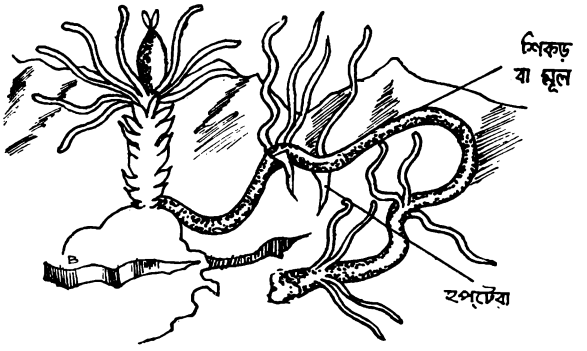

মূলসর্বস্ব গাছ পোডোস্টেমন

তোমাদের মধ্যে কেউ মেঘালয়ে বেড়াতে গেছ কোন-দিন? হ্যাঁ, চেরাপুঞ্জীর কথাই বলছি। যদি গিয়ে থাক, তা হলে তো জানই, কি প্রবল বৃষ্টিপাত হয় সেখানে। অনেকেই হয়তো লক্ষ্য কর নি সেখানকার গাছপালাদের। আর লক্ষ্য করলেই বা কি, সব গাছের নাম তো আর জানা নেই। জানা নেই, তাদের কাণ্ডকারখানার কথা। তাই দেখা, শুধু দেখাই থেকে গেছে। গাছটার নাম পোডোস্টে-মন। এটা চেরাপুঞ্জী অঞ্চলের খুব সাধারণ একটা গাছ। এই গাছের গোটা উদ্ভিদ্‌টাই একটা শিকড়। আরও অবাক হওয়ার কথা হলো, এই শিকড় দিয়েই পোডো স্টেমন সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে নিজের খাদ্য নিজেই তৈরী করে। তা ছাড়াও করে বংশবিস্তার। এই গাছের প্রাপ্তিস্থান সাধারণত ভিজে পর্বতগাত্রে। 'হপটেরা' নামে এক ধরনের সরু সরু শিকড় গাছগুলোকে পর্বতগাত্রের সঙ্গে আটকে রাখে, একেবারে যেন নিজের করে (চিত্র 2)। সাধারণত মূল মানেই আমরা বুঝি মাটির নিচের বর্ণহীন অংশ। পোডোস্টেমন কিন্তু মাটির উপর জন্মায় আর শিকড়ের রঙ-টাও হয় সবুজ। আর তাই তো তারা সালোকসংশ্লেষের ছাড়পত্র পেয়েছে। কিছু কিছু পরজীবী ও মিথোজীবী উদ্ভিদের ভেতরও এই ধরনের শিকড়ের সাক্ষাৎ মিলেছে। তার মধ্যে রাফ্লেশিয়া (পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ফুলগাছ), মোনোট্রোপা উল্লেখের দাবিদার।

বৈচিত্র্যে ভরা এমন আরও বহু গাছের সাক্ষাৎ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন—যারা আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। তাদের কথা বলতে গেলে একটা মহাভারত হয়ে যাবে।

286 সি ডি স্টেশন রোড, অণ্ডাল, বর্ধমান।

অ্যান্টি গ্রাভেটি গ্লাস

শঙ্কর দাস

বিজ্ঞানের প্রভাব প্রাচীন বহু ম্যাজিকের খেলার মধ্যে আগেও ছিল এবং এখনও আছে। বরং আধুনিক ম্যাজিকে বহু খেলায় নানা ধরনের চুম্বকের ব্যবহার, নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদি, নানাধরনের ব্যাটারী চালিত বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র এবং ট্রানজিস্টর ইত্যাদির ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। চুম্বকের সাহায্যে নানাধরনের সুন্দর সুন্দর চমকপ্রদ ম্যাজিকের খেলা দেখানো যায়। ব্যাটারী চালিত চমকপ্রদ খেলাও আছে। সামান্য পরিশ্রমে এই সব চমকপ্রদ ছোটখাট ম্যাজিকের খেলাগুলি যে কেউ বাড়িতে তৈরী করে বন্ধুবান্ধবদের কিংবা কোন অনুষ্ঠানে দেখিয়ে অনায়াসেই সকলকে আনন্দ দিতে পারা যায়।

এখানে যে খেলাটির কথা বলছি তার নাম "মর্ডান-অ্যান্টিগ্রাভেটি গ্লাস"।

খেলাটি এইরূপ -

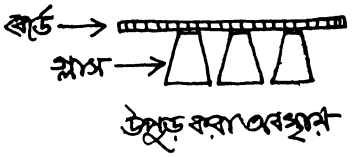

ম্যাজিক প্রদর্শক দর্শকদের তিনটি কাগজের তৈরী গ্লাস এবং ছোট প্লেটের মত সাইজের একটুকরো প্লাইউড্ কিংবা পিজবোর্ড (প্রায় চার থেকে ছয় মিলিমিটার মোটা) দেখালেন। প্রথমে তিনি বোর্ডটির উপরে কাগজের গ্লাস তিনটিকে সিধে করে সাজিয়ে রেখে, বোর্ডটির এককোণ ধরে সামান্য উঁচু করে বোর্ডটা উল্টিয়ে দিতে দেখা গেল, গ্লাসগুলি মাটিতে পড়ে গেল। গ্লাসগুলি মাটি থেকে তুলে পুনরায়, তিনি বোর্ডটির উপরে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে এইবার বোর্ডটির একটি কোণ ধরে আস্তে আস্তে বোর্ডটি কাত করে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে দিলে দেখা গেল, কোন গ্লাসই মাটিতে পড়ে যায় নি। এতে সকলেই খুব আশ্চর্য হন।

এখন খেলাটির কৌশল প্রকাশ করছি।

বলা বাহুল্য এটি চুম্বকের সাহায্য নিয়ে একটি চমকপ্রদ ছোট ম্যাজিকের খেলা যা ড্রইংরুম থেকে স্টেজেও দেখানো সম্ভব। তৈরী করতেও যৎসামান্য খরচ। আইসক্রীমের মোটা কাগজের গ্লাসের মতো ছোট সাইজের কাগজের গ্লাস বাজারে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ কোন কোন নিমন্ত্রণ বাটিতে কিংবা নিমন্ত্রিত খানাপিনায় খুবই ব্যবহার হয়। দামও খুব বেশি নয়। এইরূপ কাগজের গ্লাস তিনটি এবং গ্লাসের কাগজের রং-এর মত সামান্য কিছুটা কাগজ দরকার অন্যথায় আরও 2।3 গ্লাসের দরকার। এ ছাড়াও প্লেটের মতো সাইজের একটুকরো চার বা ছয় মিলিমিটার মোটা কার্ডবোর্ড অথবা প্লাইউডের দরকার। বোর্ড বা প্লাইউডের যত মোটা হবে ঠিক সেইরকম মোটা চৌকো বা গোল ওয়াসারের মতো শক্তিশালী চুম্বক হলে ভাল হয়। মেটালের টাকা বা পঞ্চাশ পয়সার সাইজের চুম্বকগুলি হলে সুন্দর হয়। একটি কাঁচি, ভাল আঠা এবং বোর্ডের সাইজের একটু মোটা ধরনের দু-টুকরো মার্বেল কাগজ দরকার। চুম্বকের দুটি মেরু থাকে। লম্বা করে দেখবে দুইটি চুম্বক একটির উপর আরেকটি রাখলে আটকে থাকবে। কিন্তু উপরের চুম্বকটি তুলে নিয়ে যদি উল্টিয়ে বসাতে যাওয়া যায় তো দেখা যাবে তা লাফিয়ে যাচ্ছে এবং আগের মত দুটি চুম্বক আঁটকাচ্ছে না। চুম্বকগুলি একটির উপরে আর একটি রেখে একদিকের সমস্ত মেরুর গায়ে পেনসিল বা খড়ি দিয়ে দাগ দিয়ে রাখ যাতে ওলটপালট হয়ে না যায়। কারণ একই দিক মত সব চুম্বকগুলি যথাস্থানে লাগাতে হবে।

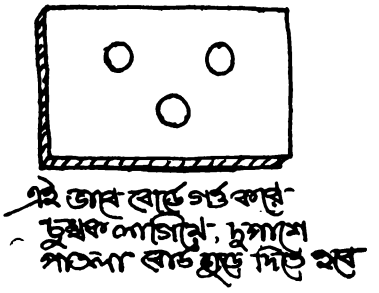

পিজবোর্ডটি কিম্বা প্লাইউডটির মাঝামাঝি স্থানে পাশাপাশি সামান্য কিছুটা দূরত্ব রেখে, চুম্বকের সাইজ মতো তিনটি গর্ত করে নাও এবং ঐ স্থানে একই মেরু একই দিকে রেখে চুম্বক তিনটি গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। এইটি পিজবোর্ড দিয়ে করলে, খুব পাতলা করে পিজবোর্ডের পিস, দু'টি ছাড়িয়ে নিয়ে, ভাল আঠা দিয়ে চুম্বক

ভরা বোর্ডের দু-পাশে লাগিয়ে দিতে পারলে, ওটিকে সাধারণ পিজবোর্ড বলে মনে হবে। ভিতরে যে চুম্বক ভরা আছে তা বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। প্লাইউডের ক্ষেত্রেও ঐ একই প্রকার করতে হবে। প্লাইউড্ জলে ভিজিয়ে তার পাতলা একটা প্লাই তুলতে না পারলে, প্লাইউডের দোকান থেকে খুব পাতলা এক প্লাইউড্ সংগ্রহ করতে হবে এবং তা চুম্বক ভরা প্লাইউডটির দুই পাশে সিরিষের আঠা দিয়ে জুড়ে দিতে হবে। কাঠের হলে এটি পালিশ বা রং করে নেওয়া যায়, অথবা ইচ্ছা করলে দুপাশে মার্বেল কাগজ লাগিয়ে দিতে পার।

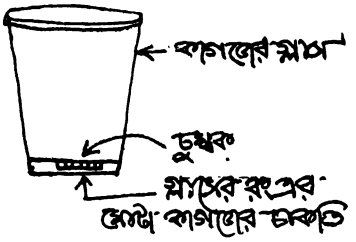

ঠিক ওইভাবে তিনটি কাগজের গ্লাসের তলায় কিংবা ভিতরে প্রথমে চুম্বক তিনটি রবার সল্যুসন দিয়ে ঠিক মাঝখানে আঁটকিয়ে নাও। তারপর যেদিকে চুম্বকটি লাগিয়েছ, সেইদিককার তলার গোল মাপে, গ্লাসের কাগজের রং-এর কাগজ থেকে, কিংবা অন্য গ্লাস থেকে, গোল চাকতি তিনটি কেটে নিয়ে চুম্বকের উপরে এমনভাবে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও, যাতে কোন মতেই বোঝা যায় না যে গ্লাসটি কৌশলযুক্ত।

খেয়াল রাখতে হবে চুম্বক-ভরা বোর্ডের কোন্ দিকে গ্লাস গুলি বসালে চুম্বকে চুম্বকে আটকে থাকবে এবং কোন্ দিকে বসালে তা আটকাবে না, পড়ে যাবে। সেইভাবে খেলাটি দেখাতে হবে। আশা করি ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছ।

খেলাটি আরও নানাভাবে তৈরী করা যায়। খুব শক্তিশালী পাতলা চুম্বক পেলে শুধুমাত্র গ্লাসগুলির তলায় লাগিয়ে সাধারণ টিনের শ্লেটের উপর বসিয়ে খেলাটি দেখানো যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথমবারে গ্লাসগুলি যে পড়ে যায় তা দেখানো যাবে না, যদি না শ্লেটটিতেও অন্য কৌশল করা হয়। আবার গ্লাসের তলায় পাতলা টিনের চাকতি গোল করে কেটে লাগিয়ে তার উপরে গ্লাসের রং-এর কাগজ লাগিয়ে, উক্ত গ্লাসগুলি চুম্বক-ভরা বোর্ডের উপরে বসিয়েও খেলাটি দেখানো যায়। বোর্ডটির একদিকে মোটা করে একইরকম বোর্ড বা প্লাইউড জুড়েও এমনভাবে বোর্ডটি তৈরী করা যেতে পারে যাতে ঐদিকে গ্লাসগুলি বসালে, বোর্ডটি উপুড় করলে গ্লাসগুলি পড়ে যাবে, কিন্তু চুম্বক-লাগানো অপরদিকে তা পড়বে না।

78 রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলি-85

মুক্তো

অলিভকুমার ঘোষ

মুক্তোর নাম তোমরা শুনেছ। এটা খুব মূল্যবান রত্ন। আমাদের শাস্ত্রে যে পঞ্চরত্নের কথা বলা হয়েছে মুক্তো তাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু সোনা-রুপোর মতো মুক্তো খনিতে পাওয়া যায় না। মুক্তো ঝিনুকের পেটে থাকে। শুনলে আশ্চর্য হবে, এই মূল্যবান রত্ন ঝিনুকের লালা থেকে সৃষ্টি হয়। ঝিনুকের ভেতরে কেমন ক'রে মুক্তো জন্মায় তা এক অদ্ভুত ব্যাপার। আর এই মুক্তোর জন্মের পেছনে রয়েছে একটা যন্ত্রণা। ঝিনুকের যন্ত্রণার ফসলই মুক্তো।

ঝিনুকের নরম দেহ দুটো শক্ত খোলা দিয়ে ঢাকা থাকে। এই খোলা দুটোর নিচে দেহের দুদিকে দুটো ঝিল্লী থাকে। এই ঝিল্লী থেকে একরকম রস বা লালা বেরয়।

এবার শোন কেমন করে এই লালা দিনের পর দিন জমতে থাকে। তোমাদের চোখে সামান্য ধূলো-বালির কণা পড়লে তোমাদের খুব কষ্ট হয়। তোমরা ঐ ধূলো-বালির কণা বার করতে চেষ্টা কর আর তাই চোখ দিয়ে আপনা থেকে জল পড়ে। ঝিনুকের নরম দেহে যদি ঐরকম শক্ত কিছু ঢুকে যায়, তা হলে ওদেরও বড় কষ্ট হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে ঝিনুক বড় অসহায়। ঐ জিনিসটিকে ওরা দেহ থেকে বার করতে পারে না। বাইরের বস্তুর আক্রমণ থেকে মূল দেহকে রক্ষা করার জন্যে ওরা তাই লালা দিয়ে জিনিসটিকে ঢেকে দিতে চেষ্টা করে। দিনের পর দিন ওরা জিনিসটির ওপর লালা জমাতে থাকে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার, লালার মধ্যে শক্ত জিনিষটি ঢেকে যাওয়ার পরেও অনেকদিন ধরে এই কাজ ওরা চালিয়ে যায়। বহুদিন ধরে লালা জমতে জমতে কঠিন হয়ে যায়। ঝিনুক এসব জানতেও পারে না। এইভাবে ঝিনুকের অজান্তেই তার দেহে মুক্তোর সৃষ্টি হয়।

সব ঝিনুকের পেটেই মুক্তো সৃষ্টি হয় না। সমুদ্রের এক বিশেষ ধরনের ঝিনুকের দেহে মুক্তো পাওয়া যায়। এদের 'পার্ল-ওয়েস্টার' বা 'মুক্তা-ঝিনুক' বলে। মুক্তা ঝিনুক সাধারণত বিষুবরেখার কাছাকাছি সমুদ্রে থাকে। এগুলি 25 সেমি. পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। মুক্তো সংগ্রহের জন্যে চার বছর বয়স্ক ঝিনুক সবচেয়ে উপযুক্ত।

সবুজ বনের গান

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এক ঃ কথা বলা বন

মার্চের এক রবিবারের সকালে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ফ্ল্যাটে অভ্যাসমতো আড্ডা দিতে গিয়ে দেখি, বৃদ্ধ ঘুঘুমশাই অফিসের বড়কর্তার মতো একটা ফাইল খুলে গোমড়ামুখে বসে আছেন। কাছাকাছি বসে ফাইলের বিষয়বস্তু আন্দাজ

করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছু ঠাহর করা গেল না। আমার উপস্থিতিও যেন উনি টের পেলেন না।

একটু পরে ওঁর মুখ দিয়ে কী একটা কথা বেরুল। মনে হল 'বঙ্গভঙ্গ' কিংবা এরকম কিছু। কথাটা উনি বিড়বিড় করে আওড়াতে শুরু করলে আর চুপ করে থাকা গেল না। বললাম, বঙ্গভঙ্গ তো ১৯৪৭ সালে হয়ে গেছে। এতকাল বাদে ও নিয়ে দুঃখ করার কী আছে ?'

কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন এবার। 'ও! তুমি এসে গেছ দেখছি ডার্লিং! তোমার কথাই ভাবছিলাম। একটু অপেক্ষা করো। কিছুক্ষণের মধ্যে এক ভদ্রলোক আসবেন এবং তোমার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্য কিছু মালমসলা তাঁর কাছে পেয়ে যাবে।'

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আজ আমার ছুটির দিন। খবরের কাগজের জন্য আজ আমার এতটুকু মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আপনি হঠাৎ বঙ্গভঙ্গ নিয়ে বিড়বিড় করে মড়াকান্নার মতো শোকপ্রকাশ করছিলেন কেন ?'

'বঙ্গভঙ্গ ?' কর্নেল ভুরু কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড। তারপর জোরে হেসে বললেন, 'না জয়ন্ত। রঙ্গোরঙ্গো। কোহাও রঙ্গোরঙ্গো।'

'তার মানে ?'

'স্পিকিং উডস। কথা বলা বন। প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেশীয় এলাকার ছোট্ট দ্বীপ ইস্টার আইল্যাণ্ডের লুপ্ত ভাষায় কোহাও রঙ্গোরঙ্গো মানে যে বন কথা বলতে পারত।'

এই সময় ষষ্ঠিচরণ এসে খবর দিল, এক সায়েব এসেছেন। তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন কর্নেল। তারপর পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে। সায়েবের নাম কাপ্তেন জর্জ বুগেনভিলি। সওদাগরী জাহাজে সারা পৃথিবী চক্কর মেরেছেন। নামটা শুনে বললাম, 'আপনার নামের সঙ্গে কি বুগানভিলিয়া ফুলের কোনো সম্পর্ক আছে ?'

সায়েব আমুদে স্বভাবের মানুষ। গড়ন প্রকাণ্ড কুমড়োর মতো। ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'আলবৎ আছে। বুগানভিলিয়া ফুল আসলে পলিনেশীয়। 1768 সালে আমার মতো এক কাপ্তেন লুই আঁতোয়াঁ দ্য বুগেঁভিলি ওই এলাকার একটা দ্বীপে এ ফুল আবিষ্কার করেন। ইউরোপে নিয়ে যান। তাঁর নামেই ফুলের নাম চালু হয়।'

কর্নেল যোগান দিলেন, 'উষ্ণ নিরক্ষরেখা অঞ্চলের উদ্ভিদ। নিক্টাজিনিসিয়া গোত্রের প্রজাতি।'

মুচকি হেসে বললাম, 'কর্নেল, আপনার কোহাও রঙ্গো-রঙ্গোর সঙ্গে বুগানভিলিয়া ফুল এবং মাননীয় অতিথি কাপ্তেনসায়েবের নামের এই যোগাযোগ সম্ভবত আকস্মিক নয়। তাই না ?'

কর্নেল সেই ফাইলটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। কাপ্তেন বুগেনভিলি সেটার দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'রাতারাতি জেরক্স কপি তৈরি দেখছি! কর্নেল, আপনার এই উৎসাহ দেখে আমার আশা হচ্ছে, এতদিনে কিওটা দ্বীপের বৃক্ষরহস্য ফাঁস করাটা আর কঠিন হবে না।'

ষষ্ঠিচরণ ট্রেতে কফি রেখে গেল। ওঁরা কফি খেতে খেতে কথা বলছিলেন। আমি ফাইলে চোখ রাখলাম। তারপর যত পাতা ওল্টাই, তত চমক জাগে। একি সত্যি, না নিছক গালগল্প ?

"...তিন বছর আগে তাহিতি থেকে অস্ট্রেলিয়া হয়ে ফেরার সময় ইচ্ছা ছিল কিওটা দ্বীপ সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। কিন্তু কোকোস দ্বীপপুঞ্জ এলাকা যেন গোলকধাঁধা। তার ওপর উল্টো বাতাস। এগোনো অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এ দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান ভারত মহাগাগরে। অক্ষাংশ 20 ডিগ্রি, দ্রাঘিমাংশ 80 ডিগ্রি। পঞ্চাশ নটিকাল মাইল দূরত্বে পৌঁছতেই হঠাৎ প্রবল দক্ষিণগামী বাতাস আমার জাহাজ 'এনডেভার'কে ঠেলে দিল বিপরীত পথে। চাগোস দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখান থেকে মরিশাস হয়ে কেপটাউন। তারপর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলাম। লণ্ডনে পৌঁছে কিছুকাল মিউজিয়াম এবং লাইব্রেরি ঢুঁড়ে কিওটা দ্বীপের রহস্য নিয়ে মাথা ঘামালাম...

"সিঙ্গিং ট্রিজ! সঙ্গীতকারী বৃক্ষ! কী অদ্ভুত কথা! অসংখ্য নাবিক এই উদ্ভট গল্পে বিশ্বাস করে। নিশ্চয় কানের ভুল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাতাস বইলে অনেক সময় গানের সুর বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক দলিলপত্রে দেখলাম, কিওটার গাছগুলো নাকি কথাও বলতে পারে।

"আমার এবারকার অভিযান অ্যাণ্টার্কটিকায়। নাবিকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাগোল থেকে দক্ষিণে না এগিয়ে উত্তরপূর্ব দিকে কোকোসের দিকে এগিয়েছিলাম। কাল সন্ধ্যায় কিওটার একমাইল দূরে নোঙ্গর করে বেঁধেছি আমার 'রেজিলিউসান' জাহাজকে। 24 নভেম্বর কেপটাউন ছেড়েছি। আজ 12 ডিসেম্বর। আবহাওয়া চমৎকার নাতিশীতোষ্ণ এখানে। সকালে একটা বোট নিয়ে তিনজন দ্বীপের দিকে এগিয়ে গেলেম। চমৎকার বেলাভূমি। ডাঙায় পৌঁছেই আমার যা অভ্যাস—বন্দুক ছুঁড়লাম একবার। তারপর ইউনিয়ন জ্যাক পুঁতে দিলাম। সমুদ্রপাখিরা কলরব করে উড়ে গেল। নিশ্চয় দ্বীপটাতে মানুষ বাস করে না। তাহলে বন্দুকের শব্দ শুনে তারা ছুটে এসে ভিড় করত। ডাক্তার স্মিথকে বললাম, 'চলুন তা হলে।' ডাঃ স্মিথ কান খাড়া করে কী শুনছিলেন। বললেন, 'কে যেন

...তারপর
ইউনিয়ন জ্যাক
পুঁতে দিলাম।

চিৎকার করে কিছু বলল।' হাসতে হাসতে উঁচু জায়গাটাতে উঠে গেলাম। আমার পেছনে ডাঃ স্মিথ আর দুজন সশস্ত্র নাবিক। সামনে ঘন জঙ্গল। বিশাল উঁচু সব অপরিচিত গাছ। স্বীকার করছি, গাছগুলো দেখে কেমন গা ছমছম করছিল। যেন তারা প্রাণীর মতো সচেতন এবং আমাদের নিঃশব্দে লক্ষ্য করছে। যেই গাছপালার ভেতর দিয়ে কয়েক পা এগিয়েছি, ঠিক যেন বাতাসের শব্দে শনশন করে কোথায় একদল মানুষ ইংরেজি ভাষায় গর্জন করে উঠল, 'স্টপ ইট!'...স্টপ ইট।

"নিশ্চয় কানের ভুল। তারপর আর কোনো ভুতুড়ে আওয়াজ আমি শুনি নি। কিন্তু নাবিকরা আর এক পা বাড়াতে রাজি নয়। তারা আমাকে অগ্রাহ্য করে চোটে গিয়ে বসে রইল। ডাঃ স্মিথ আর আমি সতর্কভাবে ছোট্ট দ্বীপটা দুপুর পর্যন্ত ঘুরলাম। জনপ্রাণীটি নেই। ফেরার সময় ডাঃ স্মিথ বললেন, একবার যেন কাদের অস্পষ্ট ফিসফিস কথাবার্তা শুনেছেন। ভদ্রলোক বড় কল্পনাপ্রবণ।...

"এখন রাত দশটা। রেজলিউশান দক্ষিণ মহাসাগরে ভেসে চলেছে অ্যাণ্টারটিকার দিকে। কিওটা দ্বীপের ব্যাপারটা গাছপালার মর্মরধ্বনি ছাড়া আর কিছু নয়। আমার ধারণা, 'স্টপ ইট' কথাটা কানের ভুল, সম্ভবত কাঠঠোকরা জাতীয় পাখি শুকনো কাঠে ঠোকরাচ্ছিল এবং তা থেকেই ওই আওয়াজ। বিদ্রোহী নাবিকদুজনকে শাস্তি দিয়েছি। পাঁচ ঘা বেত এবং 24 ঘণ্টা অনাহারের শাস্তি। ডাঃ স্মিথ একটু আগে বলে গেলেন, ওদের গায়ে নাকি সবুজ রঙের অদ্ভুত অ্যালার্জি বেরিয়েছে। সবকাজেই ওঁর বাড়াবাড়ি।.."

কাপ্তেন টমাসকুকের লগবুক। 12. 12. 1772

* * *

"...কীলিং (Keeling) দ্বীপপুঞ্জে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ফসিল খুঁজতে যাওয়ার সময় দ্বীপের এক বৃদ্ধ আমাকে কিওটা নামে অদ্ভুত একটা দ্বীপের কথা বলে। সেটা নাকি মাইল ষাটেক দক্ষিণে। সেই দ্বীপের গাছগুলো নাকি কথা বলে। অবান্তর ব্যাপার। সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু 'বিগল' জাহাজের ক্যাপ্টেন বরার্ট ফিট্‌জরয় বদরাগী মানুষ। এমনিতেই আমার কাণ্ডকারখানা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন। তাঁকে যদি বা রাজি করাতে পারি, নাবিকদের পারব না। কিওটার কথা শুনেই তারা বলেছে, 'ওই ভূতের দ্বীপ? অসম্ভব।' শেষ পর্যন্ত তাই কিওটা যাওয়া হল না। মনে ক্ষোভ রয়ে গেল।"

চার্লস ডারউইন, এইচ এম এস বিগল 23. 3. 1835

* * *

"...উদ্ধারপ্রাপ্ত নাবিকের নাম জন হিক্স। তাকে মানসিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে ভারত মহাসাগরে জাহাজডুবি হয়ে একটা দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে গাছপালা কথা বলে। তাকে খাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল একটা গাছ। হিক্সের বিবৃতির সময় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী রিচার্ড হোম উপস্থিত ছিলেন। তিনি কোনো মন্তব্য করেন নি। হিক্স আরও একটা অদ্ভুত কথা বলে।

একটা গাছের সঙ্গে তার নাকি বিয়েও হয়েছিল। ডাক্তারদের মতে, লোকটি উন্মাদ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তবে ব্রিটিশ যাদুঘরের কিউরেটার ডঃ ফক্স বলেছেন, খ্রিষ্টপূর্ব একহাজার অব্দে ফিনিসীয় নাবিকদের প্যাপিরাসে লেখা যে লগবুক আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে গর্জনকারী গাছের কথা আছে। কোনো সমুদ্রে একটি দ্বীপের পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা সেই ভৌতিক গর্জন শুনতে পেত। তাই দ্বীপে নামবার সাহস পেত না। ডঃ ফক্স আরও বলেছেন, খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে লেখা গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস সঙ্গীতকারী বৃক্ষের কথা বলেছেন। চৌদ্দ শতকে বিখ্যাত পর্যটক মার্ক পোলো লিখেছেন, ভারতমহাসাগরের একটি দ্বীপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গভীর রাত্রে তাঁরা সেখানে কোলাহল শুনতে পান। জাহাজ দ্বীপের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সারারাত আশ্চর্য সব শব্দ শোনেন। সকালে পোলো বোটে করে দ্বীপটিতে পৌঁছান। কিন্তু আর একপা এগোতে পারেন নি। প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয় এবং হাজার হাজার মানুষ যেন তাঁকে গর্জন করে এগোতে নিষেধ করে। পোলো লিখেছেন, গাছগুলো থেকেই ওই গর্জন ভেসে আসছিল। বোটে ফিরে গেলে, আশ্চর্য ব্যাপার, ঝড়টা তক্ষুনি থেমে যায়।..."

দি ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড, লণ্ডন 7. 9. 1981

* * *

"...কোহাও রঙ্গো রঙ্গো। কথা বলা বন। প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেশীয় এলাকার ছোট্ট দ্বীপ ইস্টার আইল্যাণ্ডে বিশপ জোসেন নামে এক খ্রীষ্টীয় যাজক গত শতকে একটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। তার লিপির সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার লিপির আশ্চর্য মিল। মেতোরো নামে তাঁর স্থানীয় এক ভৃত্য পুঁথিটি পড়ে অনুবাদ করে দেয়। এই পুঁথির নাম 'কোহাও রঙ্গো রঙ্গো'। এটি ইস্টার দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের ধর্মীয় পুরাণ। এতে আছে এক অদ্ভুত বনের কাহিনী—যার গাছগুলো কথা বলতে পারত। তাদের উপাস্য দেবতার নাম ছিল রাঙ্গেতিয়া। তিনি আকাশের দেবতা। তাঁর আশীর্বাদে গাছপালা কথা বলত মানুষের ভাষায়। বিশপ জোসেনের ধারণা, সেই কথা বলা বন বহু বছর আগে নির্মূল হয়ে গেছে কোনো কারণে।"

ইস্টার আইল্যাণ্ডের রহস্য : ই ডলফার পৃষ্ঠা 5

"প্যারিস, 20 জানুয়ারি—সম্প্রতি প্রখ্যাত অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন জর্জ ব্যুগেনভিলি তাঁর সপ্তদশ নৌ-অভিযানে অ্যাণ্টার্কটিকা যাবার সময় ঝড়ের মুখে পড়েন। জাহাজ ডুবে যায়। লাইফবোটের সাহায্যে ভাসতে ভাসতে সাত দিন পরে কোকোস দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপে ওঠেন। ক্যাপ্টেন ব্যুগেনভিলি জনহীন দ্বীপ থেকে গাছ কেটে ভেলা তৈরী করে সমুদ্রপাড়ি দেন। একমাস পরে কীলার দ্বীপে পৌঁছান। তিনি সেই নির্জন দ্বীপ সম্পর্কে এক অদ্ভুত বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে নাকি গাছপালা মানুষের মতো কথা বলতে পারে।..."

—রয়টার

লাইফবোটের সাহায্যে ভাসতে ভাসতে ...একটি দ্বীপে ওঠেন।

ফাইল থেকে মুখ তুলে জর্জ ব্যুগেনভিলির দিকে তাকালাম। সায়েব মিটিমিটি হাসছিলেন। (ক্রমশ)

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় **জয়ন্ত দত্ত**

যারা সব ক'টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে

24-পরগণা ঃ শৌভিক রায়। **হাওড়া ঃ** তন্ময় চৌধুরী, **হুগলী ঃ** বনশ্রী মণ্ডল, পুষ্পেন মণ্ডল, জ্যোতিপ্রকাশ চক্রবর্তী, আশিসকুমার সাহা, সৌরভ সরকার, শর্মিষ্ঠা অধিকারী, অনামিকা সাহা, দেবাশিস সাহা, শুভেন্দু চ্যাটার্জী। **মেদিনীপুর ঃ** বিপুল কুমার কির্ত্তুনীয়া, তুরারকান্তি পাল, বিমলচন্দ্র বিশ্বাস, ফণীন্দ্রনাথ হাঁসদা, সঞ্জয় নন্দী, অমিয়কান্তি বিশ্বাস, দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শান্তিপদ পাল, স্বপনকুমার মাহাতো, যমুনাকান্ত সিং, সৌমেন্দ্রমোহন পাল, মলয়কুমার মাহাতো, ফণীভূষণ মাহাতো, শুভেন্দুমোহনয় পাল, কিংশুক হালদার। **নদীয়া ঃ** সুভাষচন্দ্র আগরওয়ালা, স্নেহাশীষ চ্যাটার্জী, সুশীল আগরওয়ালা। **মুর্শিদাবাদ ঃ** বিবেকানন্দ সরকার।

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা এপ্রিল '83 সংখ্যার দশ বা তার বেশি সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

কলকাতা ঃ শৌভিক নন্দী, মলয় দাশ, অজয়েশ ঘোষাল, তন্দ্রা দাশ, প্রণবকুমার সরকার, সুপর্ণা সরকার, রুমকি সরকার, দিব্যেন্দু প্রাণিগ্রাহী, রশ্মিমা সান্যাল, শুভাশিস আতর্থী।

24-পরগনা ঃ স্মৃতিকণা কর, ইন্দ্রনীল পাণ্ডা, সৌমেন কর, সন্দীপ কর, সমীরকুমার মৌলিক, সুগত দত্ত, সৌমিত্র মজুমদার, রাণা মজুমদার, টুকুন ভট্টাচার্য্য, লাভলি ভট্টাচার্য্য, রান্টু মজুমদার, পারুল মজুমদার, সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার, বিনয় ভট্টাচার্য্য, পাপিয়া ভট্টাচার্য্য' ঝর্ণা চৌধুরী, সৌমিত্র রায়।

হাওড়া ঃ তাপসকুমার রীত, অসিতকুমার রীত, কল্যাণ পাত্র, স্বরূপ ঘোষ, অসীম হাজরা, দেবব্রত দাশ, শম্পা দাশ, সুতপা চক্রবর্তী, অপর্ণা চক্রবর্তী, সোনালী ব্যানার্জী, দেবাশিস ঘোষ, তন্ময় চৌধুরী, শেলী দাশ, রীতা ভট্টাচার্য্য সুবর্ণা চ্যাটার্জী, সৌমেনকুমার মৈত্র।

হুগলী ঃ সোমনাথ চক্রবর্তী, স্বপন মুখার্জী, তপন মুখার্জী, তনুজা মুখার্জী, শমিতা মল্লিক, অভিজিৎ রায়, অম্বরজিৎ রায়, অজয় রায়চৌধুরী, অংশুমান পাল, নবারুপ পাল, মানব সাহা, সুদীপ্ত চ্যাটার্জী, ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়, সুশান্তকুমার পাড়ুই, মমতা সরকার, আদিতি সিংহরায়, শীর্ষেন্দু সিংহরায়, শ্যামলকুমার মণ্ডল, নীলমণি দাশ, প্রণবকুমার ভট্টাচার্য, অরূপ ভট্টাচার্য্য, সায়ন ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অবিনাশ মুখোপাধ্যায়, রাজকুমার মুখার্জী, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, রত্না চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত দত্ত; সুমিতা ব্যানার্জী, অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য, সঙ্গীব মুখোপাধ্যায় শুভেন্দু দে, আশিস ঘোষ, কুশল ঘোষ, নেপালচন্দ্র মাল, শমিতা মল্লিক, যমুনা শীল, সুজয়া মুখার্জী, শিবাজী ঘোষ, সুমন মল্লিক।

বর্ধমান ঃ উদয় ব্যানার্জী, চঞ্চল চ্যাটার্জী, বুবুন ব্যানার্জী, মহামায়া দাস, ফাল্গুনী দাস, দুলাল দে, সুতপা ভট্টাচার্য্য সুরজিৎ ভট্টাচার্য্য, পর্ণা মোহান্ত, পার্থপ্রতিম মোহান্ত সনাতন রায়, আরতি রায়, পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ কোঙার, অলোক ভট্টাচার্য, পুষ্পেন্দু কোঙর,, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়।

মেদিনীপুর ঃ অরবিন্দ দাস, কণিকা দাস, অসীম দাস, সুলেখা দাস, প্রফুল্লকুমার মণ্ডল, শশাঙ্কশেখর মণ্ডল সঞ্জীবকুমার মণ্ডল, ননীগোপাল মণ্ডল, শিখারাণী মাজি, সেবক জানা, নীতা বিষ্ণু, শৈবাল বর্ধন, দেবশীষ দাস, বিক্রমাদিত্য রাণা, তপনকুমার ধর, বিশ্বনাথ পাল, ধূর্জটি প্রসাদ সাহু, মিতালীরাণী সাহু, স্বপনকুমার মাহতো, শিশিরকুমার মাহাতো, ভুপেন্দ্রনাথ মাহাতো, প্রদীপকুমার মাণ্ডি, সৌমেন্দ্রনাথ পাল, বুদ্ধদেব মাহাত, সুশংকর মাহাত, প্রকাশচন্দ্র বারিক, অরবিন্দ সাউ, অনিলকুমার সোম, অশোক দত্ত, তপনকুমার পাত্র, রবিশংকর শেঠ, সত্যব্রত জানা, মনোব্রত জানা।

নদীয়া ঃ দেবাশিস মণ্ডল, সিদ্ধার্থ মণ্ডল, পরিতোষ মণ্ডল, দেবাশিস কুণ্ডু, দেবজ্যোতি ঘোষ, পল্লব মোহান্ত, মুন্না মোহান্ত, শুভাশীষ মণ্ডল, স্বপন মণ্ডল, পার্থপ্রতিম তরফদার।

বীরভূম ঃ অনিমেষ ব্যানার্জী, অমর্ত্য ব্যানার্জী, টুপাই মুখার্জী, জীবন নাগ, অসিত নাগ, সুমিতা দত্ত, সন্দীপন দত্ত, অরুণা দত্ত, দীপনারায়ণ দত্ত, নীলকমল দত্ত, কেকা নন্দী, শম্পা নাগ, টুম্পা নাগ, বিদ্যুৎ রায়, প্রদ্যুৎ রায়, প্রণব রায়, কাঞ্চন রায়, রাজু মজুমদার, শরৎ গড়াই, চিরঞ্জীব ঘোষ, প্রলয় বৈদ্য, সাথী মণ্ডল, শম্পা সিন্‌হা, চন্দন সিন্‌হা।

* বাকী অংশ 55 পাতায়।

প্রশ্নোত্তর

1. প্রঃ—কোন্ ভিটামিনের অভাবে চুল পেকে যায়? এটা কি একটি রোগ? যদি রোগ হয়, তাহলে এই রোগের প্রতিকার করা যায় কিভাবে?

সৌমিত্র বিশ্বাস, সাহেবনগর, নদীয়া।

উঃ—কোনো ভিটামিনের অভাবে চুল পাকে না। চুল পাকার নিশ্চিত কারণ জানা নেই। এটি কোনো রোগ নয়। তাই প্রতিকার করার প্রশ্ন ওঠে না।

2. প্রঃ—সব মৌলিক পদার্থগুলির রঙ একরকম হয় না কেন? হাবিবা খাতুন, চান্দুল, হাওড়া-4।

উঃ—প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর গঠনবিন্যাস আলাদা। আমরা জানি, সাতটি রঙের সমন্বয়ে হয় সাদা রঙের সৃষ্টি। আমরা যেসব মৌলিক পদার্থকে রঙিন দেখি (যেমন তামা) তারা নিজস্ব রঙটি বাদে অন্য রঙগুলিকে শোষণ করে নেয়। মৌলের পরমাণুর গঠন-বিন্যাসের ওপর রঙ শোষণ ও রঙিন হওয়া নির্ভর করে। সে কারণে সব মৌলিক পদার্থের রঙ একরকম হয় না।

3. প্রঃ—চন্দ্রের আলোতে সূর্যালোকের মত তাপ নেই কেন?

স্বদেশরঞ্জন প্রামাণিক, সরপাই হাইস্কুল, মেদিনীপুর।

উঃ—চন্দ্রের নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের প্রতিফলিত আলোই চন্দ্র বিকিরণ করে। চন্দ্রের সেই প্রতিফলিত আলোতে তাপ একেবারে যে নেই তা বলা চলে না। কিন্তু আমাদের অনুভূতির মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ তাপ তাতে থাকে না। সে কারণে চন্দ্রের আলোতে আমরা তাপ অনুভব করি না।

4. প্রঃ—অনেকক্ষণ বসে থাকলে আমাদের পায়ের এবং হাতের আঙুল মুড়ে রাখলে আঙুলে ঝিনঝিনি ধরে। এই ঝিনঝিনি কেন হয়?

সুব্রত ও রবিব্রত ঘোষ, হর্ষবর্ধন রোড, দুর্গাপুর-4

উঃ—কোনো স্নায়ুর উপর চাপ পড়লে প্রতিবর্তস্বরূপ তার অগ্রবর্তী অংশ একপ্রকার সংবেদন সৃষ্টি করে। শরীরের কোনো অংশ মুড়ে রাখলে সেই অংশের স্নায়ু-তন্তুর উপর চাপ পড়লে ঐরূপ সংবেদন সৃষ্টি হয় এবং তা-ই হচ্ছে ঝিনঝিনি।

5. প্রঃ—মহাকাশ নিবিড় অন্ধকারময় কেন?

সুদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষনগর, 24-পরগণা।

উঃ—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণা থাকায় তা থেকে আলো প্রতিফলিত হতে পারে এবং সে কারণে পৃথিবীর আকাশকে আলোময় দেখায়। কিন্তু মহাকাশে কোনো ধূলিকণা না থাকায় সেখানে আলো প্রতিফলিত হতে পারে না। সেজন্যে মহাকাশ নিবিড় অন্ধকারময়।

ভেবে ভেবে বল ঃ চন্দন রুদ্র

1. নিচে দুটো প্রাণীর ছবি আছে, এদের নাম কি?

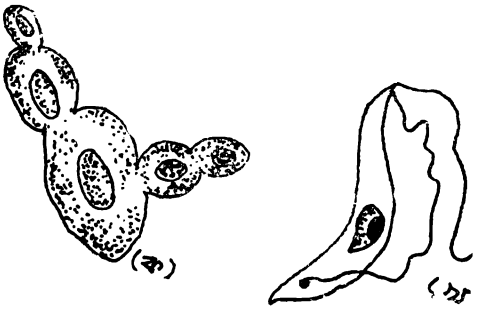

2. গাছের পাতা হলুদবর্ণ ধারণ করে যে পদার্থের অভাবে তার নাম কি বল?

4. শীতকালে মাটির নিচে গর্তে থাকার সময় ব্যাঙ শ্বাসকার্য চালায়—(ক) ত্বকের সাহায্যে (খ) ফুসফুসের সাহায্যে। কোনটা ঠিক ভেবে বল।

5. কি কারণে শরীরের ভিতর রক্তপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।

6. আমাদের দেহের কোন অঙ্গে 'অর্নিথিন চক্র' (Ornithine cycle) সধিত হয় বলতে পার?

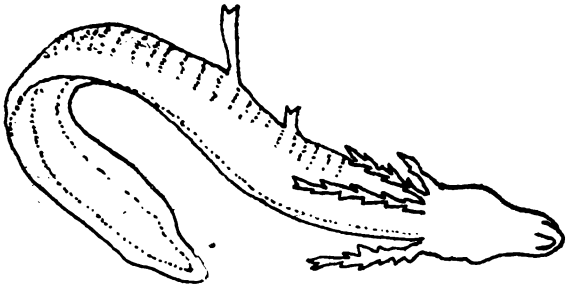

7. উপরে যে প্রাণীটির ছবি দেখা যাচ্ছে। তার নাম বল।

8. 'ফ্লোয়েম কলার মধ্য দিয়ে উদ্ভিদ্ দেহে খাদ্য সংবাহিত হয়'—একথা বলেন (ক) বিজ্ঞানী মুনশ, (খ) স্যার জগদীশচন্দ্র বসু (গ) জিমারম্যান।

9. GTH কোন কথার অ্যাব্রিভিয়েশন, ভেবে বল।

ভেবে ভেবে বল'র উত্তর

1. (ক) ইস্ট্, (খ) ট্রাইপোনো সোমা, 2. ম্যাগনেসিয়াম। 3. পান্থপাদপ নামক একরকম উদ্ভিদ, 4. ত্বকের সাহায্যে ব্যাঙ শ্বাসকার্য চালায়, 5. হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের ও প্রসারণের ফলে, 6. যকৃৎ-এ, 7. উভচর অন্ধ প্রোটিয়াস (Protius), 8. বিজ্ঞানী মুনশ, 9. গোনাডো ট্রপিক হরমোন কথার।

বাঁশদ্রোণী চাকদহ পেয়ারাবাগান, পোঃ—বাঁশদ্রোণী 24 পরগণা।

পৃথিবী যদি চুম্বক না হত / অভিজিৎ চন্দ্র

যদি পৃথিবীর কোন প্রাকৃতিক সূত্র হঠাৎ কোন কারণে উধাও হত তা হলে মৌলিক তত্ত্বাদি আর কার্যকর হত না। এমনি একটি মৌলিক তত্ত্ব হলো যে আমাদের পৃথিবী এক বৃহৎ চুম্বক এবং এর এক সুবৃহৎ চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে। এখন যদি আমরা চিন্তা করি যে কোন কারণে এই চৌম্বক ক্ষেত্রটা বিনষ্ট হলো তখন এই বিশাল গ্রহের কি হবে? এই নিয়ে চিন্তার পূর্বে আমাদের প্রথমেই চিন্তা করতে হবে যে পৃথিবীর এই বিরাট চৌম্বক ক্ষেত্রের কারণ কি?

পৃথিবীর এই চৌম্বক ক্ষেত্রের মাপ (measurement) নিতে গেলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে পৃথিবীর মধ্যে কেউ একটা বার (bar) চুম্বক রেখে দিয়েছে - অর্থাৎ এই পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রটি দ্বিমেরু (dipole)। কিন্তু আমরা জানি যে পৃথিবীর মধ্যে চুম্বকের অবস্থান সম্ভব নয়, কেন-না পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা যা, সেই তাপ-মাত্রায় কোন বস্তুর চুম্বক ধর্মটি রাখা সম্ভব নয়। তা হলে পৃথিবী চুম্বক হল কিভাবে? নানা বৈজ্ঞানিক নানা কথা বলেছেন। কিন্তু সবচেয়ে প্রচলিতকে বিশ্বাস তা হল পৃথিবীর conducting স্তর বা core-এর মধ্যে দিয়ে convection তড়িৎ প্রবাহ ঘটেছে বলে পৃথিবী একটা চুম্বক। এই বিশ্বাসের সূত্রপাত কিন্তু মৌলিক সূত্র হতে—'চৌম্বক ক্ষেত্র সর্বদা তড়িৎপ্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত।' পৃথিবীর এই চৌম্বক ক্ষেত্র সুদূরপ্রসারী—অর্থাৎ-কিনা infinity হতে পারত, কিন্তু হতে পারে-নি। এর একটামাত্র কারণ হল highly hypersonic conducting সৌর বাতাসের (solar wind) জন্য। এই সৌর বাতাসের মধ্যে সাধারণতঃ থাকে প্রোটন ও নিউট্রন। এই সৌর বাতাস পৃথিবীর চারিদিকে একটা cavity তৈরী করে যাকে বলে 'magnetosphere।'

এখন যদি এই পৃথিবীর ধারে চৌম্বক ক্ষেত্রটা না থাকত তা হলে কি হত ঃ এটা চিন্তা করতে গেলে আমাদের দুটি জিনিস মনে হয়; (1) তড়িৎপ্রবাহের সঙ্গে চৌম্বক ক্ষেত্রের কোন সংযোগ নেই (2) কোন convection তড়িৎপ্রবাহ পৃথিবীর স্তরের মধ্যে দিয়ে হয় নি। প্রথম চিন্তাটা বোধ হয় উদ্ভট। কারণ, তা হলে মূল মৌলিক সূত্রকে ভুল বলা হয়। দ্বিতীয় চিন্তাটা ঠিক হলে মানুষের বিবর্তনটা (evolution) হত অন্য রকম। তাই দ্বিতীয় চিন্তাধারাকে আমাদের ত্যাগ করতে হবে।

এখন যদি আমরা ধরে নি যে এই চৌম্বক ক্ষেত্রটি দৈব কারণে হয়েছে এবং হঠাৎ আজ ঈশ্বরের ইচ্ছা হল তিনি চৌম্বক ক্ষেত্রটাকে উধাও করে দিলেন। তা হলে পৃথিবীর কি হবে। এই প্রশ্নটা কোন সাধারণ মানুষকে করলে সে সহজেই উত্তর দেবে 'কিছু হবে না, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকলে অন্য কথা। কিন্তু চৌম্বক ক্ষেত্রের আমাদের উপর কোন প্রভাব নেই, তাই কিছুই হবে না।'

কিন্তু এই ধারণাটা সম্পূর্ণই ভ্রান্ত। আজ এই পৃথিবীর চতুর্দিকে চৌম্বক ক্ষেত্রটা না থাকলে প্রচুর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেত। প্রথমে magnetosphere-এর কোন অস্তিত্বই থাকত না এবং সৌর বাতাসের উত্তাপ বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে গরম করে তুলত। মেরু দেশে যে অরোরা বোরিয়ালিস দেখা যায় তা আর দেখা যেত না। কসমিক রশ্মিও বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে পৃথিবীর আবহাওয়াটাই পাল্টে ফেলত। এই চুম্বক ক্ষেত্রটা না থাকলে কম্পাস হত অচল এবং জাহাজের নাবিকদের সেই পুরাকালের মত তারার অবস্থান দেখে দিক নির্ণয় করতে হত। কিছু ধরনের পাখি, মাছ ও মৌমাছি আছে যারা দিক নির্ণয় করে এই পৃথিবী চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে। এই সব জীবদেরও কঠিন সময় অতিবাহিত করতে হত। কিন্তু এই মুহূর্তে কেউ হয়তো চিন্তা করবে, তা হলে electric generator এবং dynamo চলবে কিভাবে? কিন্তু মনে রাখতে হবে electric generator বা dynamo পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা চালিত নয়, Faraday's সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

46।1 রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-700006

---

53 পাতার * চিহ্নিত অংশ

মুর্শিদাবাদ ঃ পলাশ মোহান্ত বিকাশ মোহান্ত, মানস মোহান্ত, কৌস্তুভ সান্যাল, অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য, বৈদ্যনাথ দে সঞ্জীব সরকার, পার্থ সান্যাল, আব্দুল মান্নান, দেবাশিষ বিশ্বাস।

বাঁকুড়া ঃ গুরুদাস মিত্র, গুরুদয়াল মিত্র, গুরুসদয় মিত্র, চিন্তামণি চার, সৈকত চার, গার্গী মিত্র, কল্পনা চার,

পুরুলিয়া ঃ সুদীপ ব্যানার্জী।

মালদহ ঃ অনিন্দ্য বিশ্বাস, শম্পা বিশ্বাস, অমলকৃষ্ণ চৌধুরী, শেখর চৌধুরী, সরিৎ দাস, তনুজ দাস।

জলপাইগুড়ি ঃ জয়জিৎ লাহিড়ী।

দার্জিলিঙ ঃ জ্যোতিষ সরকার।

আসাম—ডিব্রুগড় ঃ রজত দাস, শমীক গঙ্গোপাধ্যায়, সুরজিৎ কর্মকার।

বিহার—ধানবাদ ঃ স্বরূপ মুখার্জী, জয়দেব ঘোষ, সৌমেন্দ্রনাথ নন্দী।

সাঁওতালপরগণা ঃ স্বপন কুমার রায়।

সংখ্যাকুট

সুবীরকুমার দাস

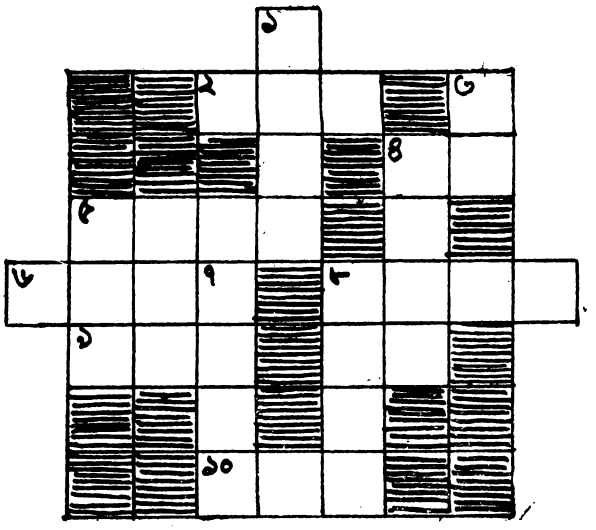

সূত্র ঃ পাশাপাশি ঃ

2. প্রতি গ্রাম বিশুদ্ধ জলের বাষ্পীভবনের লীনতাপ যত ক্যালরি। 4. আর্গন নামক মৌলের পরমাণু ক্রমাঙ্ক। 5. হলুদবর্ণের আলোকরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত অ্যাংস্ট্রম। 6. মাইকেল ফ্যারাডের জন্মসাল। 8. বিজ্ঞানী কুলম্বের জন্মসাল। 9. পোলোনিয়াম নামক মৌলের নিউক্লিয়াসে নিউট্রন সংখ্যা। 10. বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের মৃত্যু হয় যত খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

উপরনিচ ঃ 1. জলে শব্দের গতিবেগ সেকেণ্ডে কত মিটার। 3. ইথিলিন নামক যৌগের আণবিক গুরুত্ব। 4. ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতির কথা প্রথম জানা যায় যত খ্রীষ্টাব্দে। 7. ক্যালকুলেটিং মেসিন আবিষ্কৃত হয় যত খ্রীষ্টাব্দে। 8. ভাইরাসের উপস্থিতির কথা প্রথম জানা যায় যত খ্রীষ্টাব্দে।

(গত সংখ্যার বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার উত্তর)

1. না। করলে তা গলে যাবে। 2. চেকোশ্লোভাকিয়ার রসায়নবিজ্ঞানী 'জ্যারোশ্লাভ হারোফস্কি'। 3. জীবকোষের নিউক্লিয়াসের অন্তর্গত সূত্রবৎ একরকম রহস্যময় পদার্থ। 4. নাইট্রোজেন গ্যাস। 5. তরল বায়ুর সংস্পর্শে এলে এরা এত কঠিন হ'য়ে পড়ে যে তখন আঘাত করলে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যায়। 6. D. N. A. নেই। আছে R. N. A. অর্থাৎ রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। 7. জলজ উদ্ভিদ বাঁচত না। 8. ঈস্ট্রোজেন। 9. নিম্বাস মেঘ। 10. অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল ও কোবাল্টের সংকর ধাতু। 11. —78°C. 12. লঘুতর মাধ্যমে। 13. অ্যাম্বারগ্রীজ। 14. অপ্সরা। 15. 'বাষ্পমোচন' প্রক্রিয়ায়।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

অমরনাথ রায়

1. তরলের উপর চাপ কমালে তরলের স্ফুটনাংক বাড়ে না কমে?

2. কোন্ ব্যাক্টিরিয়া দুগ্ধ শর্করাকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত করে?

3. স্টোমা বা পত্ররন্ধ্র কাকে বলে?

4. INSAT কথার অর্থ কি?

5. টায়ালিন নামক উৎসেচক কোথা থেকে নিঃসৃত হয়?

6. মানুষের দেহের একটি মিশ্রগ্রন্থির নাম কি?

7. শিঙি ও মাগুর মাছের শুঁড় কি কাজে লাগে।

8. ট্রাম লাইনে বা ট্রেন লাইনে তড়িৎপ্রবাহের তার বেশ মোটা থাকে কেন?

9. কোন তারের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ দ্বিগুণ করলে ঐ তারের উত্তাপের পরিমাণ কিভাবে পরিবর্তিত হবে?

10. কোন্ কোন্ উদ্ভিদের স্তম্ভমূল আছে?

11. বোরিক অ্যাসিডের সংকেত কি?

12. 'আনারসের চোখ' জিনিসটা কি?

13. আলোক, বেতারতরঙ্গ ও এক্স রশ্মির মধ্যে কোন্‌টির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম?

14. নিয়ন গ্যাসের আবিষ্কর্তা কে?

15. এক সমকোণ = কত রেডিয়ান? = কত ডিগ্রী?

(উত্তর পরবর্তী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার সমাধান

আ	ম	রা	X	ষ্ট্র	বে	রি
X	হা	ই	জে	ন	স	X
X	ক	খ	X	সি	X	জ
ব	র্ষ	X	টা	য়া	লি	ন
ট	X	X	X	ম	X	ড়া
ম	হা	শূ	ন্য	X	ডো	ল্ট
লী	ন	তা	প	বো	র	ন

জুলে ভার্নে-র টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী : লেখা ও ছবি গৌতম কর্মকার

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 3rd year • May 1983 Regd No WBCC/50

উপহার ও পাঠাগারের বই

কিশোর ক্ল্যাসিক্‌স

অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর

তেপান্তর	১৫-০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছোটদের কাশীনাথ	৬-০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোর অপু	১৫-০০
অপুর ছেলেবেলা	৬-০০
ছোটদের অপরাজিত	৬-০০

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের কাজল	৬-০০

বুদ্ধদেব বসু

অপরূপ রূপকথা	১০-০০

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি প্রণীত

বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার	১০-০০
মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন	৮-০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪-০০
বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ	৪-০০
পরমাণুবিজ্ঞানী ভাবা	৪-০০

সমরজিৎ কর

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী	১০-০০

সাধন দাশগুপ্ত

আলো আরও আলো	১৫-০০
রোমাঞ্চকর রসায়ন	১২-০০

নতুন বই ! ছবির বই !! খেলার বই

সিদ্ধার্থ ঘোষ

অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ৮·০০

বাক্সের মধ্যে বই ও এক বাক্স খেলার সরঞ্জাম

ছবি ও ছড়া

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

খুকুমনির ছড়া	১০-০০
রাঙা ছবি	৩-৫০

অন্নদাশঙ্কর রায়

হট্টমালার দেশে	৫-০০

ঘনাদা ও টেনিদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদার জুড়ি নেই	৫-০০
মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা	৫-০০
ঘনাদা বিচিত্রা	১২-০০

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়

টেনিদার অভিযান	১৫-০০
চারমূর্তি	৫-০০
ঝাউবাংলোর রহস্য	৫-০০
কম্বল নিরুদ্দেশ	৫-০০

ফ্যান্টাসী, রহস্য ও অভিযান

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দরবনে সাত বৎসর	৫-০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হাতিচোর	৬-০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা	১০-০০
রামধনু	৬-০০

দক্ষিণারঞ্জন বসু

কায়াহীনের কবলে	৪-০০
হট যাও হার্মাদ	৫-০০

ধীরেন্দ্রনাথ ধর

দুরন্ত যাত্রী	৫-০০

কোনান ডয়েল

শার্লক হোমসের কিশোর গোয়েন্দা গল্প	৭-০০
শার্লক হোমসের কিশোর রহস্য গল্প	৭-০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ • ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা–৭০০০৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত
এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
প্রচ্ছদমুদ্রণ রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২